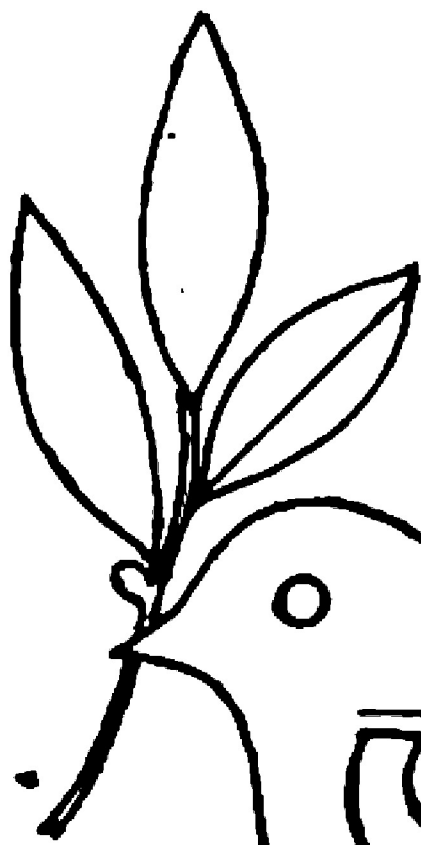




আভি



মাসিক পত্রিকা

অষ্টাদশ বর্ষ

১৮তম সংখ্যা।

১৩৯৭

সম্পাদিকা - রেখা চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ভারত-আত্মজ্ঞা নিবেদিতা (কবিতা)—দিগন্তর দাসগুপ্ত	১
পথের দিশা (কবিতা)—বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২
প্রথম বেলার প্রেম (গল্প)—শিব শঙ্কর	৩
আমার দাছ ৮৮৮৮৮৮৮ ও দিদিমা গিরিবালা—মণিকা ঘোষাল	৭
কোথায় গেলে পাবে কেহ (ধারাবাহিক উপন্যাস)—শোভনা সেন	১১
পরিচয় (ধারাবাহিক উপন্যাস)—সুনীল কুমার মল্লিক	১৫
ইক্ষু সমুদ্র (ধারাবাহিক উপন্যাস)—জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
মাগর ছহিতা (ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী)—বেথা চট্টোপাধ্যায়	২১
সম্পাদিকার কথা—	২৫
চলার পথে বলার কথা—বহুদর্শী	২৫

ক: ৩য় পৃষ্ঠা

সম্পাদিকা : বেথা চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক : ডাঃ গোবিন্দ দাস চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রণ : কৃষ্ণা আর্ট প্রেস

প্রচার : জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

অচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণে - দিগন্তর দাসগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান : আভা কার্যালয় - ৭৩সি. শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৭-৮১৭২

— নিয়মাবলী —

গ্রাহকদের প্রতি

- ১। গ্রাহকদের এক বৎসরের টাঙ্গা সডাক ১৫ টাকা। আজীবন গ্রাহক টাঙ্গা সডাক ১০০ টাকা।
- ২। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
- ৩। ভি পিতে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়। গ্রাহকদের টাঙ্গা মনি অর্ডার যোগে 'আভা' কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।



অষ্টাদশ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা



চৈত্র
১৩৯৫

March
1989

তম্বাসা য়া জ্যোতির্গময়

॥ ভারত-আত্মজা নিবেদিতা ॥

দিগন্তর দাশগুপ্ত

প্রতীচোর সবস্বখ দিয়ে বিসর্জন
 পরানীন এ ভারত ভূমি পথে এসে
 আর্ত-জন সেবাত্রেতে আত্মনিবেদন
 করেছিলে জানি তুমি গুরুরই নির্দেশে ।
 শত বাধা বিঘ্ন তুমি হাস্য মুখে সয়ে
 অটল অচল চিত্তে গুরু-দত্ত ভার
 তুলে নিয়েছিলে স্বক্রে । এসন্ন হৃদয়ে
 পালন করিতে শুভ কর্ম সেবিকার ।
 হৃৎ-জ্বালা সন্তানের মোচনে নিয়ত
 স্নেহময়ী জননীরই মত তুমি জানি
 এক হাতে গ্লানিভার দূর করে যত
 অন্যহাতে কল্যাণের শুভ দীপখানি —
 ছেলেছিলে । লোকমাতা, নিবেদিতা তুমি,
 সত্যিই সার্থক তোমা গুরুদত্ত নাম
 ভালবেসেছিলে মনে প্রাণে প্রাচ্যভূমি
 ভারত-আত্মজা তুমি তোমাকে প্রণাম ।

গথের দিশা

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্কেশ্বর)

ধর্মের সকল তত্ত্ব করি প্রণিধান
বিচার করিয়া সব মার্গের বিধান ;
শাস্ত্রের যতেক সার করি সংকলন,
মিটিলনা আশা তবু, ভরিল না মন ।
বৃথাই লম্বিনু শুধু মরিচীকা পিছে
ব্যর্থতার বোঝা ব'য়ে, অকারণে মিছে ॥

অনিত্যের বৃত্ত হ'তে নিত্যের স্থিতিতে,
অজ্ঞান আধার হ'তে আলোক বস্তুতে,
ভেদ করি জন্মমৃত্যু চক্র চিরন্তন,
হোলনা অমৃতলোকে চির উত্তরণ ।
ক্লেশের প্রসন্ন মূর্তি পড়িল না ধরা,
ব্যর্থতার হতাশায় এ হৃদয় ভরা ॥

কেটে গেছে রাত্রি কত, কেটে গেছে দিন,
জপের আসনে বসি বিরাম বিহীন,
স্মরণে, মননে গভীর নিদিধ্যাসনে,
কত বিনিময় রজনী কাটে সঙ্গোপনে ।
ঘুটিলনা ঘন তিমিরাবৃত এ জড়তা,
চৈতন্যলোক, আজিও অজ্ঞাত, দুরাগতা ॥

মনে হয় পথ নাহি, নাহিক উপায়
শেষ নাই বুঝি, এ আসা যাওয়া হায় !
জীবনের প্রান্ত সীমায় দাঁড়ায়ে হেরি,
পিছনের পদচিহ্ন গিয়াছে আবরি ।
সমুখে নিবিড় আধার ঢাকা চৌদিক,
পথ নাই, দিশা নাই, ক্লান্ত এ পথিক ॥

ব্যর্থতার ঘানি আর হতাশার কলে,
কণ্টরোধ ক'রে মোরে টেনে নিয়ে চলে,
গভীর আধার কোন অতলের তলে,
চির বিস্মৃতির মাঝে টানিয়া সবলে ।
নাহি আশা, নাহিক ভরসা, নিরুপায়,
এই শেষ পরিণতি চরম ব্যর্থতায় ॥

তবে তাই হোক, এই যদি পরিণতি,
জীবনের এই বোঝা, কেন বহি নিতি,
টানি চির যবনিকা এ জীবন পটে,
লুপ্ত ক'রে দিই এই ব্যর্থ অস্তিত্ব ঘটে ।
নিজ হাতে নির্ঝিচারে, —সকল ভীষণ,
আজি হোক সব শেষ, এসেছে সে ক্ষণ ॥

কি জানি কি যে হ'ল ! ভেদি তমসা ঘন,
সহসা ফুটিল, আলোক রেখা কি ঘেন,
উচ্চারিত হ'ল বাণী—অন্তরীক্ষে কি মনে ?
কি জানি ? ওরে মূঢ়, কেন নাশ অকারণে,
ও দেহটারে লাগ্ত পথের ক্লান্ত পথিক ?
বৃথাই লম্বি শুধু, পথের নাহিক ঠিক ॥

এতদিন ধরে যা কিছু করেছ বলেছ,
অহমিকা জালে সবে জড়ায়ে ফেলেছ,
তুমি বলে কেহ নাই বিশ্ব চরাচরে,
'আমি' শুধু আছি তব দেহের আধারে,
তোমার ও দেহটায় 'আমি' চালাই তাই
'তুমি' চল 'আমি' চলে গেলে 'তুমি' আর নাই ॥

কাটিল আঁধার, ঘুচিল মোর মোহাক্কার
উদ্ভাসিল দিগন্তে রক্তিম আভা চারিধার,
পথের দিশা মিলেছে এত দিন পরে,

এবে যাত্রা শুরু নবালোক পথ ধরে ।
নৈর্ব্যক্তিক চন্দ্রা, যন্ত্র সম অবিচল,
'আমি' নাই, 'তুমি' শুধু চালাও এ বল ॥

প্রথম বেলার প্রেম

শিবশঙ্কর

প্রথম বেলার প্রেম বলতে বুঝতে হবে—কোন কিশোরী ও কিশোর মধ্যে সদ্য যৌবন প্রাপ্ত তরুণের যে প্রেম সঞ্চার হয়। এই প্রথম প্রেম প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় ব্যর্থ হয়—তরুণ-তরুণীর শেষ পর্যায়ান্ত মিলন হয় না। এটা যেন বিধাতার অভিশাপ বলে মনে হয়। অনেকে বলবেন—এ হচ্ছে “কফ-লভ”, ছেলে মানুষী ব্যাপার তাই চিরস্থায়ী হয় না। আসলে, এই বয়সে যে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয় তার শিকড় অজ্ঞাপ্তে খুব দৃঢ় হয়—সহজে উৎপাটন করা যায় না। সুপ্ত অবস্থায় শেষ জীবন পর্যায়ান্ত থেকে যায় দুজনকেই মধো—যদিচ দুজন দুদিকে ছিটকে যেতে বাধ্য হয়েছে নানা কারণে। এই দেখুন না, শরৎচন্দ্রের ‘দেবদাস’ গল্পে—দেবদাস ও পার্শ্বতীর শেষ পর্যায়ান্ত মিলন হলো না এরকম উদাহরণ বহু আছে, আরেকটি, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্প—“অরক্ষণের নিমন্ত্রণ”—হীরাণ্য সঙ্গে আর কুমীর বিয়ে হলো না। কিন্তু যে “সুপ্ত ভালবাসা” এদের মধ্যে ছিল তার বিনাশ হয়নি।

এই রকম প্রথম প্রেম কয়েকটি—নি-লা ও ডাঃ ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্যের মধ্যে। প্রথম যৌবনের প্রারম্ভে ছেলেদের একটা প্রবল আকর্ষণ হয় মেয়েদের সংস্রবে আসার-যেমন বলে, “Like charges repel but un-like charges attract”. ইন্দ্রনীল সবে ডাক্তারী পাশ করেছে। ওর কোন ডাক্তার বন্ধুর সৌজন্যে ‘নি-লা’দের পরিবারে পরিচিত হয়। ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে ঘনিষ্ঠতার দানা বাঁধে। এই পরিবারে মা, বাবা, দাদা ও অন্যান্য বোনও ছিল। এই ঘনিষ্ঠতায় ক্রমশঃ প্রেম সঞ্চার হতে থাকে। নি-লা মেয়েটি সুন্দর গান গায়। সেই যুগে রেডিওতেও গান গাইত। নি-লা সুশ্রী, গলার স্বর মধুর—কোকিল-বক্তি ও মিষ্টি স্বভাবের-তাই ওর আকর্ষণী শক্তি ছিল। বলা বাহুল্য, ইন্দ্রনীল মেয়ে মহলে মেশার তেমন সুযোগ পাইনি। কাজেই মেয়েটিকে ওর ভালই লাগলো। ক্রমে প্রেম একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠ হইল। তবে আসল কথা কেহ বলেনি—“আমরা পরস্পরকে ভালবাসি”—মনের কথা মনেই রয়ে গেল। মা-মেয়ের মধ্যে অবশ্যই কথাবার্তা হয়েছে। এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটলো—নি-লার খুব জ্বর, “হাই-ফিভার”। ডাঃ ইন্দ্রনীল খবর পেয়ে রক্ত নিয়ে নিজে মেডিকেল

কলেজে পরীক্ষা করে—‘ম্যালিগ্নেন্ট মেলেরিয়ার’ জার্ম পেয়ে ওকে নিজে গিয়ে “কুইনিন” ইন্জেকশন দিয়ে আসে ও যত্ন করে চিকিৎসা করে। সুস্থও হয়ে যায়।

এর কিছুদিন পরেই একদিন ওর মা বিয়ের প্রস্তাব করে। কিন্তু এর জন্য ইল্লনীল একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিল, সবদিক বিবেচনা করে। বিশ্লেষণ করে মাকে হয়তো সব কথাই বলেছিল—তখন বয়স ২৬, বেকার, চাকুরী বা প্র্যাক্টিস্ কিছুই করেনা, সংস্থান কিছুই নেই—কেবল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ট্রেনিং নিচ্ছে। বাবার বশে ওকে চলতে হয়। সেই যুগের বাবারা সবাই প্রায় পুরাতন-পন্থী ছেলে নিজে পছন্দ করে অপর পক্ষের তরফ থেকে চিঠি লেখাচ্ছে—এ সহ্য করতে পারতেন না। নির্যাতন অবশ্যম্ভাবী। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিজের ভালবাসার পাত্রেীকে হাত-ছাড়া করতে হলো। নিলা ভবিষ্যতে সুখ-শান্তিতে থাকুক। ওর মুখে হাসি ফুটে উঠুক—এই তখন ছিল ইল্লনীলের ধ্যান-ধারণা। তাই নিজের ‘হৃৎকষ্ট’ গোপন রেখে নিলার বিয়েতে উপস্থিত ছিল একটি ‘ভালবাসা’ বা ‘স্নেহের’ চিহ্নস্বরূপ মনের মত আংটি দিয়েছিল পরিয়ে। তারপর, দ্রুত যবনিকা—একটি ছেলে হলো। তাকে দেখতে ওর বাতী গিয়েছিল—এইখানেই শেষ দেখা।

তার পরের ইতিহাস ডাঃ ইল্লনীলেরও বিয়ে হলো ৪৬ বৎসর বিবাহিত জীবনের পর স্ত্রী-বিয়োগ হলো। স্ত্রী ছিলেন ওর কাছে একটি রত্নবিশেষ। ওকে চিরকালের মত হারিয়ে ডাক্তার খুব মর্মান্বিত হয়ে পড়ে। চার বৎসর হ’য়ে গেল এখনও ওর আহত-হৃদয়ের ‘ঘা’ শুকোই নি। এখন নিঃসঙ্গ জীবন, মনের শান্তি নেই ক্রমশঃ আরো খারাপের দিকেই যাচ্ছে। বয়সও বেড়ে যাচ্ছে।

এমত অবস্থায় সাঙ্ঘনা দিয়ে কে ওর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে শান্তি দিতে পারে? মনে পড়ে গেল ইল্লনীলের—সেই নিলার কথা, অর্ধ শতাব্দী আগেকার প্রিয়-বান্ধবী নিলা। তাই ভাবলে, নিলার খোঁজটা নিইনা কেন? বেঁচে আছে তো? বেঁচে থাকলে ঐ একমাত্র ওর মনঃ কষ্টে সাঙ্ঘনা দিতে পারবে। সেই স্মৃতি প্রেম ধ্বংস হয়ে যায়নি। তাই চিঠি লিখলে নি-লার উদ্দেশ্যে। সেটা সংক্ষেপে পড়ে শোনাচ্ছি—

কল্যাণীয়াসু, স্নেহের নিলা, তোমার খোঁজ নেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও এতকাল নেওয়া হয়নি। এখনই যেন মনে হলো—আসল সময় হয়েছে। জীবনের অনেক ওলোট্-পালট্ হয়ে গেছে—আমার জীবন-সঙ্গিনী (তোমার বৌদি) আমাকে ছেড়ে আজ ৪ বৎসর হলো চিরকালের মত চলে গেলেন। একেবারে Heart Broken হয়ে পড়ে আছি সেই থেকে আমার অন্তরের ব্যথা বুঝবার ও সাঙ্ঘনা দেবার ক্ষমতা তোমারি আছে। অনেক ভেবে চিন্তে তোমাকে জানালাম। তুমি অবশ্যই মর্মান্বিত হবে। তোমাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিতি সেই ১৯৩৬ থেকে। একের পর এক সিনেমার পরদার মত সব ঘটনাবলী চোখের পরদায় এসে যাচ্ছে। তোমার মা আমায় খুবই

স্নেহ করতেন। তোমার প্রথম ছেলে হবার পর দেখতে যাই। তোমার বোন চাকুলতার খবর কী? তোমার স্বামী রবিবোসের সঙ্গে পরিচয় হয় সেই সময়। সেই বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা।

আজ থেকে ১৭ বৎসর আগে আমাদের হাসপাতালে (কি করে জানলে জানি না) তোমার একটা চিঠি পাই। কোন রুগীর ভণ্ডির ব্যাপারে। তখনই সেই ক্ষণিকের চোখের দেখা ঠিকানাটা মনে একেবারে গাঁথে গেল। ওর ওপর নির্ভর করেই এই চিঠি লেখা। শেষ পর্যন্ত পৌছাবে কিনা কে জানে! ভগবানের কৃপা থাকলে হয় তো ঠিকই পাবে। খুব জানতে ইচ্ছা করচে গানের চর্চা এখনও কর কী? আমার মনঃ তুষ্টির জন্য কত গানই না শোনাতে। আমার প্রাণভরা স্নেহ-ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করলাম। ইতি ইন্দ্রনীলদা।

এরপর ১ মাস কী তারো বেশী কেটে গেল। কিন্তু কোন চিঠি আর পায়নি ডাক্তার। তারপর, অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে গেল চিঠি—নিলা যথারীতি ভগবানের কাছে আমার মনে শাস্তি আশুক এই প্রার্থনা জানিয়ে অনেক কিছু লিখেছে তারমধ্যে আসল কথা অভিমান করে লিখেছে—“হাসপাতালে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম তার জবাব না পেয়ে খুঁই দুঃখিত হয়েছিলাম”—তারপর লিখেছে আরো বেশী অভিমান করে—“তুমি জীবনে অনেক ভুল বেরেচো—অনেক, অনেক ভুল।” আবার লিখেছে “তোমার চিঠিটা রোজ একবার বার করে পড়াই আমার একটা কাজে দাঁড়িয়েছে। তোমার ভাল লাগার গানের দুটি গান লিখে পাঠাচ্ছি। তুমি এলে পরে তোমায় গান শোনাবো তাই চর্চা করচি।” নাঃ, সত্যিই নিলা এখনও আমায় ভোলে নি।

তারপর ইন্দ্রনীলের চিঠি প্রথমতঃ হাসপাতালের চিঠির জবাব দিই নি তার কারণ আমার চিঠিতে হয়তো তোমাদের ‘গৃহ-শাস্তি’ ভঙ্গ হতে পারে এই আশঙ্কায়। দ্বিতীয়তঃ ‘ভুল করার’ যে অভিযোগ করচো তারজন্য অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। তুমি ভুল বলতে যা বোঝাতে চাও তা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু, এ ‘ভুল’ ইচ্ছাকৃত। তবুও কারণগুলি খুলেই বলি। তোমার মা বিয়ের প্রস্তাব তুলে ছিলেন তা তো তুমিও নিশ্চয় জানতে। প্রত্যাখান করি, কেননা আমি তখন হাসপাতালের “হাউস্ ফিজিসিয়ান্” ট্রেনিং এ আছি, কোন চাকুরী বা প্র্যাক্টিস্ করি না। আমার বাবার বশে চলতে হতো সকালের বাবারা তো প্রায়ই পুরাতন-পন্থী, ছেলে পছন্দ করে চিঠি লেখাচ্ছে—এ সহ করতে পারতেন না। ফলে, নির্যাতনই হতো। ভেবেছিলাম তোমাকে বলি, “তুমি কী নীলা আর দুটো বৎসর অপেক্ষা করতে পারতে না? তখন স্বাধীনভাবে নিজস্ব ক্ষমতায় তোমার ভার নিতাম।” তুমি সুখ-শান্তিতে থাকো এই আমার কাম্য ছিল। যে যাহাকে ভালবাসে সে তার সুখের জন্য সব রকম কষ্ট স্বীকার করে। নিজেকে অপরাধী বলে মনে করি। তাই সারা জীবনটাই আমার ভুলে ভরা এখন এ সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। তবে আমার মনে এইটুকুই আনন্দ যে তুমি উপযুক্ত স্বামী পেয়েছ। তোমার ছেলেরা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। মেরেকে সংপাত্রে দিতে পেরেছ। আর বৌমারা নাভী-নাভনী এসব নিয়ে এখন

তোমার ভরা সুখের সংসার। তোমার পরিবাহে—পুত্র। কথা বোঝার সবাই তো আধুনিক যুগের, হলেও কার মনে কী Reaction হবে জানি না। স্বামী যদি উপার হোন তবে তো সবাই Easy way তে নেওয়া উচিত। ওদের যেন এই ধারণা না হয় আমি তোমাদের 'গৃহ-শান্তি' নষ্ট করলাম। আমি তো দাদা বলেই পরিচয় দিয়েছি তবে পরম বন্ধুও বটে। এই সমুদ্র যেখানে, সেখানে অবাধ মেলা-মেশায় কোন পাপ স্পর্শ করতে পারে নি, কারণ, আমাদের হৃদয়েরই অন্তর শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও নির্মল ছিল। নিছক পবিত্র প্রেমেই হয়েছিল। যাকু তবুও তুমি সব চিঠিই ছিঁড়ে ফেলে নষ্ট করে দিতে পার। কিন্তু, তোমার প্রাণ চাইবে না তাও জানি, কারণ এ সব যে আমার অন্তরের কথা। তোমার ও আমার পুরাণো স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে তোমাকে নিয়ে যাবে সেই সব রঞ্জিত দিনের যুগে। ইতি তোমার চির-বাহিত বন্ধু ইন্দ্রনীলদা। এইভাবে চিঠির আদান প্রদানে প্রায় সব কথাই বলা ও জানা হয়ে গেল। পরে তোমার সাদর নিমন্ত্রণে কলকাতায় গেলাম তোমায় দেখতে।

আজ সেই মিলনের দিন সমুপস্থিত। কত সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলে ঘরে সবাই মিলে। এতদিন পরে তোমায় দেখে ভাবোচ্ছাস, হলো—চোখের জল গড়িয়ে পড়লো, কথা যেন আর মুখ ফুটে বেরতে চায় না। তুমি সজল চোখে প্রণাম করলে আমিও যথারীতি মন প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলাম। যতটা পারি নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর, তুমি আমার প্রিয় গানটী গেয়ে সংবর্ধনা করলে। “সুন্দর হে অতিথি আমার……আসিলে আজি নব প্রভাতে। (ওগো) চির বাঞ্ছিত বন্ধুতুমি, জাগালে আমার নয়ন চুমি……ইত্যাদি”। গানটী এমন মর্মস্পর্শী, সুমধুর কণ্ঠে গাওয়া আমি তন্ময় হয়ে শুনি। কিন্তু এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পরে দেখা মনে হলো স্বপ্ন দেখছি—সেই ১৭ বৎসরের সুন্দরী তরী কিশোরী চেহারাই পরদায় এতকাল ভাসছিল। এখন ৬৭ বৎসরের বয়স্কা মহিলা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ‘নিলার সেই হাসি, সেই গালে টোল পড়া, মুখের আদল, গলার স্বর, চোখের চাউনি তেমন বদলায় নি। চিন্তে ভুল হয়নি। কিন্তু এই ৫০ বৎসরে, তিলে, তিলে পরিবর্তন আমার চোখের সামনে হলে টেরও পেতাম না। এই ক্রমিক রূপান্তর না হয়ে একে বারে লাফিয়ে ৫০ বৎসরের পরিবর্তন হলো। কিশোরী থেকে, ক্রমে যৌবনে, প্রৌড়তে ও শেষে বৃদ্ধিতে প্রাপ্ত হয় নি। তাই নিলার হুই রূপই দেখলাম হুই মূর্তিই স্থায়ী হয়ে রইল। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। নিলারও সেই আশ্চর্য্য অনুভূতি। আজ আমার বহুদিনের পুঞ্জীভূত বাসনা পূর্ণ হলো ও আমার মন-প্রাণ পরিতৃপ্ত হলো। এর বেশী নিলাও চায় না, আমিও চাইনা।

আমার দাছ ও বরদাকান্ত ও দিদিমা গিরিবাল

যথিকা ঘোষাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঠাকুরের নির্দেশে পূর্বিয়া থেকে ফরজাবাদ গিয়ে নিজ প্রফেসনে যোগ দেন। সেখানে খুব ভাল পশার কমে ও প্রচুর অর্থোপার্জন হতে থাকে। কিন্তু প্রতিপত্তি-বাড়ীঘর ইত্যাদি সত্ত্বেও দাছর কর্মে অনীহা প্রকাশ পায়। কিন্তু গুরুদেবের নিবেদে কর্মভাগ সম্ভব হয়নি। আবার তাঁরই আদেশে গয়ায় যেতে হল। ভাবলেন, ঠাকুরের এক লীলা খেলা। গয়ায় গিয়েও আইন ব্যবসায় প্রভুত উন্নতি হতে লাগল। ক্রমক্রমে পশার যখন তুলে তখনই গোস্বামীপ্রভু স্বপ্নাদেশে বিন্দুনাথ দ্বিধা না করে জুড়িগাড়ি—বাড়ী অর্থসম্পদ সর্বস্ব অবহেলায় ভাগ করে, গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে ঢাকা গোঁসাইজীর চরণে আশ্রয় নিলেন। আর সংসারে আবদ্ধ থাকলেন না। যেন প্রস্তুতই ছিলেন সেজন্য।

আমার দিদিমা গিরিবালার মাতামহ ছিলেন গুণগাণ্ডয়ের মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামশিরোমণি। স্মরণ্য তাঁর দৌহিত্র সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। ওদিকে জমীদার শ্যামাকান্ত একমাত্র ভ্রাতাকে সকালে ও ঐকু বয়সেও যথেষ্ট শিক্ষা দিতে ক্রটি করেননি। জমিদারী রক্ষা করতে বিদ্যার প্রয়োজন। ঢাকা লক্ষ্মীধাকার সেন্টফ্রান্সিস কনভেন্টে দিয়েছিলেন ইংরেজী শিক্ষার মানসে। সেখানে খুব বেশীদিন পড়ার সুযোগ না হলেও ইংরাজীতে মোটামুটি দখল ছিল। আমরা দেখেছি দিদিমার পড়ার কি অসম্ভব নেশা ছিল। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী, শনিবারের চিঠি থেকে হেন পত্র পত্রিকা ছিল না যার গ্রাহক তিনি ছিলেন না। যখন তাঁর চোখের দৃষ্টি নিতান্ত ক্ষীণ তখনো দেখতাম নাকের কাছে বইখানা ধরে পড়ছেন। অনেক সময় আমিও পড়ে শোনাতাম।

আমি একটু আধটু লিখতাম। দিদিমার অনুপ্রেরণা আমাকে উৎসাহ দিত।

দিদিমার কাছে শুনেছি, দাছ নাকি অসম্ভব বাক্তিত্বসম্পন্ন ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। সেই কারণে দিদিমার জীবন নানা ঘটনা বহুল। তাঁরই কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিতে বাসনা হল। দীর্ঘকাল অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে এই লেখার চেষ্টা। কাজেই সঠিক পারম্পর্য্য রক্ষা করা হল না হয়তো।

দিদিমা স্বতন্ত্রালয়ে আছেন। বড় পরিবার। জমীদার শ্যামাকান্তর মত অবস্থাপন্ন নয়। স্মরণ্য বাড়ীর অন্যান্য বধূদের মত দিদিমাকেও গৃহস্থালীর কাজকর্ম ও রান্নাবান্না করতে হতই।

আদরিণী কন্যার পিতার কানে সে সংবাদ যেতে তিনি ব্যাকুল হলেন। কি করেন! অনেক ভেবেচিন্তে একজন দাসী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দিলেন। আশা মেয়েকে তবে আর খাটতে হবেনা।

এতে দাড়তো মহাখাঙ্গা। কী—এতবড় ধৃষ্টতা! বাড়ীর অন্য বউরা যদি কাজ করতে পারে তো মেজবৌ পারবে না কেন! নবাবনন্দিনী যদি অপারগ হ'ন তো দাসীসহ তিনিও বিদায় নিতে পারেন।

দিদিমা তো ভয়ে কাঠ।

বাবাকে লিখে জানালেন, 'করেছ কি? এমন কাণ্ড করতে হয়? আমার একটুও কষ্ট হয় না। আমি খুব ভাল আছি।'

সচ্ছল পরিবার নয়। সুতরাং বাড়ীর গৃহিনীর ব্যবস্থামত শিশু-বৃদ্ধ ও পুরুষদের দুধ খাবার পর যদি উদ্ধৃত থাকে তবেই বধূরা দুধ পাবে। নতুবা নয়।

জমিদার সকাশে কি করে যেন সে সংবাদ পৌঁছে গেল। বাবার মুখে তো দুধ রোচেনা। অন্ধস্নেহে আবারো এক ভুল করে বসলেন। মেয়ের স্বশুরালয়ের নিকটবর্তী এক গোয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হল দৈনিক পাঁচ-ছয় সের (তখনকার ওজোন 'সের'এ ছিল) দুধ যাবে মেয়ের বাড়ী। যাতে সে বাড়ীর সব বধূরাই পাতে দুধ পেতে পারে।

আর যাবে কোথায়। জামাইর কানে সে বার্তা পৌঁছালে তিনি তো অগ্নিমূৰ্তী। রেগে মেগে গোয়ালাকে তাড়ালেনই। প্রেরকেরও চৌদ্দপুরু উদ্ধার করেন আর কি। তাঁরা কি ভিখারী? অপমান করার এত সাহস! ঘরের বউদের দৈনিক দুধ খাবার বিলাসিতা থাকবে কেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

দিদিমার বাবারও জমিদারি রক্ত, কী—জামাইর এতবড় আশ্পর্ক। আমার মেয়েকে নেবার সময় মনে ছিল না যে তাকে দাসীবাঁদির মত রাখা চলবে না। জামাইর এত দেমাক কিসের।

তাঁর মনে রইল না যে ৮কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সজ্জন ব্যক্তির কন্দর্পকান্তি বুদ্ধিমান মেধাবী ছেলের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে তার এবং স্ত্রীর কত আগ্রহ ছিল।

এইসব নানাকারণে স্বশুর-জামাইর মধ্যে মনান্তর ও মতান্তর ছিলই। একবার কোনো অজুহাতে মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। বাবার মনের অভিলাষ মেয়ের জানা নেই। ভেবেছেন, দিন কয়েকের ক্ষণ বাপের বাড়ী বেড়াতে আসা।

বাবা অনেক ভনিতা করে মেয়েকে বললেন: কুকী তোকে আর স্বশুর ঘর করতে হবে না। আমার যা আছে তাই নেড়ে তোর জীবন সুখে সচ্ছন্দেই কেটে যাবে।

বাবার কথা শুনে কুকী তো কঁকিয়ে উঠল। বাবার কি মাথা খারাপ? স্বামী ছেড়ে বাপের ঐশর্য্য দিয়ে কি করবেন তিনি।

দিদিমার মা স্বামীর পায়ে মাথা কুটলেন মেয়ের হয়ে, এ কেমন ভেদ! স্বামী ছাড়া মেয়েদের জীবন বৃথা। এমন চণ্ডালের রাগ ভাল নয়।

বাপের এক কথা, মেয়েকে আর পাঠাবেন না।

স্বশুর-জামাইর টানা পোড়েনে দিদিমার তো প্রাণান্ত।

মেয়েকে নিয়ে জমীদারমশাই নানাস্থানে ঘুরে বেড়ালেন, মেয়ের মন ভুলাতে । মেয়ের তো বাপের আদরে মন ভরে না । স্বামী বিরহে ক্ষীণতনু ।

অনেক ঘুরে টুঁরে ঢাকার লক্ষীবাজারে প্রাসাদোপম নিজ আলয়ে বসবাস করতে লাগলেন শ্যামাকান্ত ।

শ্বশুরের অগোচরে বরদাকান্ত স্ত্রীকে জানালেন, অমুকদিন শেষরাত্তিরে তোমাদের খিড়কীর দোরে অপেক্ষা করব । যদি স্বামীকে চাও তবে এক কাপড়ে চলে আসবে । সঙ্গে অলঙ্কারাদি আনা চলবে না । অন্যথায় জানবে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কের এখানেই ইতি । বাপের ঐশ্বর্য্য অথবা স্বামী এ দুটোর যে কোন একটা বেছে নিতে হবে ।

দিদিমা গোটা রাত চোখের জলে ভাসালেন । বাবা-মার নয়নের মনি, তাঁদের এতবড় আঘাত কি করে দেবেন । তাঁর বিশ্বাস এভাবে বাবাকে হেয় করলে তিনি আর কন্যার মুখদর্শন করবেন না । আবার স্বামীর তেজের সঙ্গেও বিলক্ষণ পরিচয় আছে ।

এই দোটানায় গোটা রাত কাটল । অবশেষে স্বামীর প্রতি অনুরাগই জয়ী হল । তাঁর কাছে যাওয়াই মনস্থ করলেন । ভাবলেন, যতই রাগ করুন বাবা হয়তো একসময় সন্তানকে ক্ষমা করলেও করতে পারেন । কিন্তু স্বামী তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্কে ছেদ টানবেন নিশ্চিত ।

রাত্রির শেষযামে এক কাপড়ে খিড়কীর দরোজায় এসে অপেক্ষারত স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন । বাবার উদ্দেশ্যে চিরকুট রেখে এলেন, “বাবা অবোধ-অবাধ্য সন্তানকে ক্ষমা কোরো । মেয়েদের স্বামী ছাড়া গতি কি ।”

দাঙ্কু সদন্তে অদূরে দণ্ডায়মান ঘোড়ার গাড়িতে নিজ বিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে পলায়ন করলেন ।

কিছুদিন স্ত্রীকে নিয়ে এখানে-ওখানে-সেখানে লুবিয়ে রাখলেন । কেন না তিনি জানেন, পরাক্রমশালী শ্বশুর মেয়ের খোঁজ পেলে জবরদস্তি বজা করতে পেছপা হবেন না ।

হলেনও না । কিভাবে, কেমন করে খোঁজ খবর পেয়ে দিদিমাকে পুনরায় আপন নিলয়ে নিয়ে আবদ্ধ করে রাখলেন । দাঙ্কুতো আর দিদিমাকে সর্বক্ষণ ট্যাঁকে করে ঘুরতেন না । জমীদারমশাই সেই সুযোগ নিলেন । অবশ্য দিদিমা খুব নরম প্রকৃতির ছিলেন । কোন কিছুতেই নিজের জোর খাটাতে পারতেন না । কারো মনেই আঘাত দিতে পারতেন না । কাজেই স্বামীরও না, বাবারও না ।

শ্যামাকান্ত মেয়েকে নিজ দখলে রেখে জামাইর বিরুদ্ধে মামলা টুঁকে দিলেন । অজুহাত —জামাই স্ত্রীর প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করতো । সেই কারণে তার কাছ থেকে মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন । কিন্তু জামাই বরদাকান্ত তাঁর হেফাজৎ থেকে স্ত্রীর সম্পূর্ণ অমতে জোর করে অপহরণ করে নিয়ে যায় । পুনরায় না নিতে পারে সেজন্যই সতর্কতা ।

মামলা চলল। মেয়েকে তো বাবা পাখীপড়া করে শেখাতে লাগলেন, জজের প্রশ্নের জবাবে যেন বলে যে তার নিতান্ত অনিচ্ছা ও অমতে স্বামী জোর করে নিয়ে গেছেন।

মানী পরিবারের কন্যা স্ত্রীরাং কোর্ট-কাছারি বা আদালতে যাবার প্রশ্ন ওঠে না বাড়ীতেই কমিশন বসল।

সময় উপস্থিত বাদী-বিবাদী সওয়াল-জবাবের সময় পিতার মুখে চুনকালি দিয়ে বশ্বা বলে বসলেন, “আমি সম্পূর্ণ স্বইচ্ছায় আমার স্বামীর সঙ্গে গিয়েছি।”

বাসু মামলা খতম। জন্মদাতা পিতা হলেও মেয়ের উপর যে আর দখল নেই আবারো মর্মে উপলব্ধি করে মর্ম্মাহত হলেন। শুধু আহতই হলেন না। রাগে অগ্নিশর্মাও হলেন। ফলে দিগবিদিক স্তানশূণ্য হয়ে বিস্তর বাড়ী ঘর সম্পত্তি তছনছ করে ফেললেন। অর্থাৎ বিক্রী করে দিলেন।

এ সবই আমার দিদিমার নিজের মুখে শোনা কাহিনী।

“এখন তো মহাপুরুষ দেখছিস তোদের দাতুকে। আগে কম জ্বালিয়েছেন আমায়।”

দিদিমার কৃত্রিম দোষারোপ ও ক্ষোভে হেসে বলেছি, আ-হা জ্বালাতন না আরো কিছু। কন্দর্পকাস্তি বরের প্রেমে আত্মহারা ছিলে। নয়তো বাবা মাকে কাঁদিয়ে বরের সঙ্গে পালিয়ে যাও ?

অবশ্য এসব আমার দাদামশাইর সন্ন্যাসজীবনের বহুদিন আগের ব্যাপার।

দাতু সন্ন্যাস গ্রহণ করে সম্পূর্ণভাবেই গোঁসাইজীকে আশ্রয় করেন। নাম-ডাক-পসার কিছুই প্রতিই আর আকর্ষণ বোধ করলেন না। তখন গোঁসাই ধ্যান, গোঁসাই জ্ঞান। সর্বতোভাবে গোঁসাইজীতে মগ্ন।

দিদিমা তখন তাঁর অবশিষ্ট পিতৃ সম্পত্তি ভরসা করে, তাই দিয়ে সস্তানদের মানুষ করা, বিবাহাদি সম্পন্ন করেন। লক্ষ্মীবাজারের সেই বিখ্যাত বাড়ীটিও বিক্রী করতে হয়েছিল। শত প্রয়োজনেও স্বপ্তরের সাহায্য যিনি প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন, সেই দান্তিকতা, আত্মসম্মানবোধ সবই ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করে নির্লিপ্ত-নিরহঙ্কার-নির্বিবল্ল মানসিকতায় পরিবর্তিত হন।

দিদিমা সস্তানাদিসহ দাতুর নির্ম্মিত গেশুরিয়ার বাড়ীতেই বসবাস করতেন। সেই বাড়ীতে দিদিমা নিজের হাতে অপক্লপ ফুলের বাগান করেছিলেন। দেখতাম, দিনের প্রায় অধিকাংশ সময়ই বাগানের পরিচর্যা করছেন। কলকাতার গোব নার্সারি থেকে রকমারী ফুল ও পাতাবাহারের বীজ ও চারা আনিয়ে সেই বাগানকে সমৃদ্ধিশালী করেছিলেন। এই হবি তার আজীবনের দেখেছি। অনেকেই সেই বাগান দেখতে আসত। সুসাহিত্যিক ও সুগায়ক অ. ক. ব. সেই সুদৃশ্য ফুলবাগানের আকর্ষণে প্রায়ই যেতেন। এখনো মনোমুগ্ধকর বাগানের প্রশংসায় মুগ্ধ। অজিতদাও

গেণ্ডারিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর মা গোঁসাইজীর আশ্রিতা ছিলেন এবং গোঁসাইজী সমর্পিতপ্রাণা ছিলেন।

শুধু কি ফুলের বাগান? বত রকমের ফলের কলম ও তাঁর হাতে প্রাণ পেয়েছে। কিছু পেয়ারা, আম, কাঁঠাল তো ছিলই, ভলপাই, চালতাও বাদ যায়নি। তাঁহাড়া উঠানের মাঝখানে বিপুল ডালপালা বিস্তৃত একটি আম গাছ ছিল। যার কোটরে একটি সাপ বাস করত। তাকে দুধকলা দেওয়া হ'ত। এই বিশাল বিটপীর একটি ডালও কাটা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ শোনা গেছে ঐ গাছের নীচে নাকি একজন ককিরের আসন ছিল।

আমার এক মামা একটু সাহেবি ধাঁচের ছিলেন। তিনি এসব বিশেষ মানতেন না বা বিশ্বাস করতেন না। তাঁর শোবার ঘরের জানলায় গাছের একটি ডাল অন্ধকার সৃষ্টি করায় দিদিমার অনুপস্থিতির সুযোগে সেটা বেটে ফেলেন। সত্যি মিথ্যে জানিনা (কাকতালীর হতেও পারে) তারপর থেকে মামাবাড়ীর পরিবারে অনেকগুলি শোকের ব্যাপার ঘটতে লাগল। এরপর আর কারো সাহস হয়নি সেই বৃদ্ধ আমগাছটির অঙ্গে আঘাত করতে। জানি না এখনো সেই গাছ তেমনই বহাল অবস্থাতে আছে না তাকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

আমার দিদিমা গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ৬শ্রীকান্ত সেনের পুত্রবধূ আশালতা সেন সমিতির সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁরই বিরাট প্রাঙ্গণে 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' ছিল। আমরা সেখানে চরকা কাটা, তামেচা-বাহারা করে লাঠিখেলা, ছোরা খেলার চর্চা করতাম দেশোদ্ধারের অর্থাৎ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায়। ৬পুলিন দাস মাঝে মাঝে গিয়ে আমাদের তালিম দিতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী কমলাদি (কমলা দাশগুপ্তা) আমাদের ছোটদের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতেন। সে একদিন গেছে।

স্বাধীনতা লাভ ও দেশ বিভাগের পর আশা মাসীমা পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) সংখ্যা লঘু মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরই ছেলে সমর সেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। আশা মাসীমা পরে দিল্লীতে সমর সেনের কাছেই থাকতেন। কিছুদিন আগে কাগজে দেখলাম তিনি সেখানে পরলোকগমন করেছেন।

আমার দিদিমা স্বাধীন ভারত দেখে যেতে পারেন নি।

এই ছিলেন আমার দাদামশাই বরদাকান্ত এবং দিদিমা গিরিবালা দেবী।

। সমাপ্ত ।

কোথায় গেলে গাবে কেহ

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

(শান্তনা সেন)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জ্বললো হাজার বাতি। বাজতে থাকে সানাই। জমকালো ব্যাণ্ড বাদ্য.....যাকে নাকি পূর্বে বলা হতো ইংরাজী বাজনা। দেশী ঢোল, কঁাসর, ঘণ্টা সানাই—তারাও দাবী জানালে এসে। সব রকম পাটিই একে একে বাজতে থাকে। বেনারস থেকে ভাড়া করে আনা হলো নাম করা সানাইওয়াল। লাগলো যেন কম্পিটশন সবরকম বাজনার। হাজার বাতির সঙ্গে চললো বাজী পোড়ানোর ধুম।

রাত দশটার পর লগ্ন। বিরাট জায়গা। মাঠের একদিকে বসবার জায়গা কোরে নিজেদের আপন জনের ছুচারটি গায়ক গায়িকা স্মৃষ্টি ও সুললিত কণ্ঠে গান পরিবেশন কোরলেন। কিছুক্ষণ বাজনা বন্ধ রইল। গান গাওয়া চললো। তারপর ব্যাণ্ডপাটিয়া গং অর্থাৎ সন্মিলিত কিছু কিছু অন্ত বাজনার সঙ্গে ব্যাণ্ড বাজাতে লাগলো। সবশেষে বেনারসের সানাইওয়াল মাতিয়ে দিলো সন্মাইকে। ওরই ফাঁকে ফাঁকে চলছে ঝাওয়া দাওয়ার নিখুঁত পাট।

ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে গ্রামভুক্ত সব নিমন্ত্রিত হয়েছে। সমভাবে সবাইকেই সমাদর করা হচ্ছে। গ্রামের লোক মহা উৎসাহে এসে শুভকাজে যোগ দিয়ে সাহায্য করছে।

বর্ধমান থেকে বর আনানো হলো—অতি সমাদরে, সেকথা বলাই বাহুল্য। উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব অনেকেই এসেছেন। সুকল্যাণের সঙ্গে, বিদেশ থেকে বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন—ডাঃ মাষ্টার মশয়। যে বাঙালী বাড়ীতে সুকল্যাণ গেটে হয়েছিলো, সেই বাড়ীরই আর এক পাটে থাকতেন এরা। বাড়ীটি কিনে নিয়েছেন। ইনি বহুদিনই লগ্ননে আছেন। দেশ চীনে। বিয়ে করেছেন বাঙালী। ভাইপো ভাইঝিরাও বাঙালী ভাবাপন্ন। ছুজনেই ডাক্তারী পড়তেন সুকল্যাণের সঙ্গে।

মাষ্টার মশায়কে সুকল্যাণ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করতো। স্বভাবগুণে সুকল্যাণকেও মাষ্টার মহাশয় খুব ভালবাসতেন। মাষ্টার মশয়ের ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান প্রীতিও এই ভালবাসার আরও একটা কারণ। আর একবারও এদেশে এসে কিছু কিছু জটীল জায়গা দেখে গিয়েছিলেন নাকি। সেজন্য ইন্ডিয়ার উপর প্রবল আকর্ষণ হওয়ায় ফের এলেন প্রিয় ছাত্র সুকল্যাণের বোনের বিয়েতে। সুকল্যাণ তার বোনটির জন্য যতটা পারে, ভাল ভাল জিনিস—যা নাকি ভারতে দুপ্রাপ্য, সে

সব কিছু কিছু নিয়ে এসেছে, উপহার দিতে। ঝিমলীর জন্য সুকল্যাণ ও তার বাবা ব্যাঙ্ক চেক উপহার দিলেন, তা' বেশ মোটা অঙ্কেরই।

উভয় পক্ষের নানা রকমারী নিয়ম কানুন ও উভয়ের পুরোহিতদের নানা প্রকার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বরকনের চার হাত এক হলো। হয়তো বা দুটি মনও চিরতরে এক হলো।..... সমস্ত কিছু সমাধা হয়ে, বরকনে অনেক রাতে বাসরে এলো।

প্রশান্তর বন্ধুরা ঝিমলীর গান শুনে চাইলে। আবার নিজেরাই কথাবার্তা বোলে স্থির করলে, এতরাতে কেনেকৈ কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না। পরদিন সবাই এসে গান শুনে যাবে। আজ বিশ্রাম দেওয়া হোক।

প্রশান্ত ও ঝিমলী। দুজনেই কচি মনে দাগ পড়েছিলো। বড় হয়েছে হয়তো আশা করেছিলো দুজনেই দুজনাকে। বিধাতা সেটা পূর্ণ করায় উভয়েই খুশী। কিছু কিছু মনের কথাবার্তার আদান প্রদান হলো। প্রাথমিক আবেগ ও উচ্ছ্বাসে আলাপন চললো কতক্ষণ। উভয়েই শ্রান্ত। পরস্পর বিশ্রাম নেবার অনুমতি নিয়ে চোখ বুজলে। মনের মাঝে কথা ও আনন্দে ঢেউর পর ঢেউ বয়ে যেতে থাকলেও সংযত হয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লে।

পরদিন ভোর থেকেই সবাইকে নানা কারণে ব্যস্ত থাকতে হলো—বিদায়, ব্যথার ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। রাত থাকতে সানাই এর সুর সবলের মনকে আকুল কোরে তুলেছে। আজ ঝিমলী স্বস্তির বাড়ী যাবে। মা, -মেয়ের চোখের জল বাধা মানছে না। ঝিমলীর দাদা সুকল্যাণ সঙ্গে যাবে, এটাই তাঁর বড় সান্ত্বনা। জ্যাঠাবাবু অর্থাৎ সুকল্যাণের বাবা যাবেন, তাতেও ভাল লাগছে। দুই বাড়ীতেই গোছ গাছের তোড়জোড় পুরোদমে না করলে, সব শুছিয়ে সজ্জায় ট্রেন ধরা দায় হবে। দুই একজন সকালেই রওনা হয়ে গিয়েছেন এলাহাবাদে, সব কিছু যাতে ঠিকমত হয়, সেই ব্যবস্থা করতে। ঝিমলীর ঠাকুরমা রাজলক্ষী দেবী, ঝিমলীর জ্ঞাত মনের ব্যাকুলতা সংযত কোরে, শক্ত মনে, শক্ত হাতেই সব কিছু পরিচালনা করতে লাগলেন সুষ্টুভাবে সত্যাবাবু আর প্রিয়ত্রতকে যেন, তাদের সেই আগেকার সেই মাকে মনে করিয়ে দিলে, যাকে নাকি জীবনের অনেকটা সময়ই জমিদারী চালাতে হয়েছিলো। শুধু চালিনাই নয়, শৃঙ্খল্যয় চালিয়েছেন।

গৃহদেবতা মদন মোহনও উৎসবে সেজেছেন মোহন সাজে। আর সেজে যেন উজ্জ্বলতর রূপে উৎসবে যোগ দিয়েছেন। রাজলক্ষী দেবী আজ মাসখানেক হয় দেশে এসেছেন। এসেই মন্দিরের সবকাজ নিজহাতে কোরেছেন। শুনয়না দেবীও কোরেছেন যথাসাধ্য দেবসেবা। আমাদের ঝিমলীও বসে নেই। এই একমাস প্রাণঢেলেই সে মা ঠাকুমার সঙ্গে সংসারের কাজ কর্তব্য কোরে কিছুটা দায়িত্বের অংশ নিয়েছে আপন আগ্রহে। এই কটা দিনে বেশ কাজ শিখেছে। মা, ঠাকুমার কথা অঙ্করে অঙ্করে প্রতিপালন করেছে।

আজ সবার এই প্রাণপুষ্পুলি খুলে বসে যাবে। এত আনন্দের মাঝে বিয়োগ ব্যথাও কম নয়। চিরকালের মাধুর্যময় উপলব্ধির ব্যাপার। ঘরে ঘরে সর্বকালের একই ব্যথা আনন্দ উপভোগ করে থাকে। সকাল থেকে ঝিমলীর চোখের জল, সবাইকেই অশ্রুসিক্ত করেছে; এত কাজের মাঝেও। ক্রমে সন্ধ্যা আগত প্রায়। বরপক্ষ ছেলেবো নিয়ে রওনা হলো। বর্ধমান গিয়ে এলাহাবাদের ট্রেন ধরবে সবাই।

সুকল্যাণ কন্যাপক্ষের হয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে রওনা হলো এদের সঙ্গে। ওদিকে সে ওবাড়ীর ভাণ্ডে—বিশেষ আদরের ভাণ্ডে। সুকল্যাণের মা বেঁচে থাকলে হয়তো এই ইতিহাস অন্যমোড় নিতো কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ মনে জাগছে বারবার, তিনি থাকলে কত না সুখের হতো।

পরদিন প্রিয়ব্রত এলাহাবাদে রওনা দিলে। লোকজনসহ ফুলশয্যার জিনিষপত্র তত্ত্ব নিয়ে। বো ভাতের পরদিনই ফিরবে।

গ্রামের উৎসব এসে, এলাহাবাদ সহর রাস্তায় উঠলে, একই ঘেন অশ্রু রঙে। গ্রামে অনেকটা জায়গা নিয়ে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্রের আগমন, কাঙ্গালী ভোজন, ব্রাহ্মণ বিদায়—উৎসব সমারোহ ঘেন সাগর সঙ্গমের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আবার এলাহাবাদের প্রচুর আয়োজন। সবাই ভদ্র, শিক্ষিত, মার্জিত। আলো, বাজনা, বাজী মস্ত উৎসব। ধনী ও মধ্যবিত্ত, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবীই বেশীর ভাগ। কম নয়; হাজারের উপর লোক নিমন্ত্রিত। লম্বা রাস্তায়, বহুদূর পর্যন্ত বহু গাড়ী দাঁড়িয়ে। মাইকে গাড়ীর নান্দার ডেকে, সবার ফিরবার বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে—ভীড়ের জগ।

মুহ, মুহ বাজনা বাজছে। কথাবার্তা গল্পগুচ্ছ সবই চলছে। বাজনার জন্য কোন অশ্রুবিধার সৃষ্টি হয় নি।

ঝিমলীকে পেয়ে সবাই খুব খুশী। প্রশান্তর ঠাকুমা ইতিমধ্যে নাভবো-এর কীর্তন শুনেছেন, আর অত কাজের মাঝেও, প্রশান্তর বাবা প্রকাশ মুখার্জী গানগুলি রেকর্ড কোরেছেন। খবর পেয়ে নিমন্ত্রিতেরা ও প্রশান্তর বন্ধুরা টেপে গান শুনেই খুশী হলো। গভীর প্রকৃতির প্রশান্ত ও আজ আর গভীর নয়, হাসি খুশী। বন্ধু বান্ধবরা সবাই ঠাট্টা কোরে প্রশান্তকে সাবাস ও বাহাবা দিলে।

প্রিয়ব্রত, বোভাতের পরদিনই রওনা দিলেন বাড়িতে। ঝিমলীর কাকার জন্য মন খারাপ হয়ে গেল খুব। প্রণাম করতে প্রিয়ব্রত ঝিমলীর মাথায় হাত রাখলে। ঝিমলীর চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। প্রিয়ব্রত ও অন্য সবাই ব্যথিত হয়ে উঠলেন।..... প্রশান্তর ঠাকুমা ঝিমলীকে স্বাস্থ্যনা দিয়ে বললেন, কটা দিন বাদেই খোকন (সুকল্যাণ) তোমাদের নিয়ে বর্ধমান যাবে। মন খারাপ করিস না। আমাদের ভাল লাগে না রে।

ক্রমশঃ

পরিচয়

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

সুতীল কুমার ঘড়ল (বীরভূম)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

“আপনার ধারণা, বিয়ে করলে তাঁকে সুখী করতে পারবেন না, এই তো?” “তাইতে মনে হয়”। “শ্রেফ বাজে কথা, অলীক কল্পনা মশায়; ভাল দেখে বুলে পড়ুন, আমার তো মনে হচ্ছে— আপনার ভাগ্যে যিনি আসবেন তিনি অশেষ সৌভাগ্যবতী!” “অনাগতাসৌভাগ্যবতী! প্রশংসার অশেষ ধন্যবাদ, আপাতত ওঠা যাক্. হয়তো স্কুল বাউণ্ডারীতে আর কেউ নাই।” বলেই সে উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন চম্পকবাবুও। ঘর থেকে বেরুতে কিরণকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চম্পকবাবু বললেন, “আরে কিরণ যে, সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছে বোধহয়, আমাদের বললেই পারতে?” লজ্জাগত নেত্রে কিরণ বললো, “না স্যার, শুধু শুধু আপনাদের গল্পটা নষ্ট করে কি লাভ, তাই আর”—আচ্ছা আচ্ছা—বলে, হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

স্কুল থেকে বাইরে এসে হাঁটতে হাঁটতে চম্পকবাবু বললেন, “জানেন সঞ্জীববাবু, কিরণ ছেলেটি বড় অবিভিয়েক্ট, এই স্কুলেরই ছাত্র. পয়সার অভাবে পড়তে পারেনি, কিন্তু সুন্দর ব্যবহার আর গুছিয়ে কথা বলার কায়দা আছে।” “দেখেই মনে হচ্ছে তাই।” “আপনার যে কোন প্রয়োজন ওর কাণে পৌঁছলেই আর ভাবতে হবে না, একবারে হাতের কাছে পেয়ে যাবেন।” “কর্তব্যে নিষ্ঠা আছে নিশ্চয়।” “ভাগাটা ভাল নয়, মানুষের মতো মানুষ হতে পারতো।” “সুযোগের অভাবে অনেককৈ এটাই তো ঘটছে।” একথার কোন উত্তর দিল না চম্পকবাবু। স্কুলের গাভী ছাড়িয়ে তারা রাস্তায় নেমে পড়লেন। এগিয়ে চললেন সঞ্জীবের বাসা বাড়ীটার দিকেই।

(১২)

শরতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সবার মনেই খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। সর্বস্তরের মানুষের মনেই অনুরাগিত হচ্ছে আনন্দের স্বাদ গ্রহণের পূর্বাভাস। খেটে খাওয়া মানুষ কয়েকদিনের জন্য দুঃখ দারিদ্রের কথা ভুলে আনন্দে মেতে উঠবে; কোন সমস্যাই তাদের ঘিরে ধরতে পারবে না এই কদিন। অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্তির আনন্দ শিহরণের একটি অন্যতম

শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। চাকুরীজীবী মানুষদের মনে কাজ থেকে ছুটি উপভোগের উদ্ভাবনা। সব মিলিয়ে পূজার সার্বজনীন আনন্দের ডাক আসছে সামনেই। সব কিছুতেই তার প্রস্তুতি। এ প্রস্তুতি পর্বে মহিমপুরও পিছিয়ে নেই। পিছিয়ে নেই অপরের। কিন্তু এই আনন্দের দোলায় কেমন যেন একটা বাধা বাধা ভাব এসে ধাক্কা দিচ্ছে সঞ্জীবকে। সে ধাক্কা পুষ্পিতার অনাদৃত জীবনের কথা ছেবেই। চম্পকবাবুর কাছে পুষ্পিতার কথা যেটুকু জানার সুযোগ হয়েছে তাতেই সে মর্মান্বিত, আর তাই বাধ্যত্ব করে তুলছে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী সঞ্জীব নয়, তবুও অন্তর থেকে কে যেন বারবার তাকে এ ব্যাপারে সাড়া জাগিয়ে তুলছে। তাই কিছুদিন হল নির্জনতা তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে—নির্জন প্রিয়তার মূল হয়তো পুষ্পিটাকে ঘিরেই।

মহিমপুরের মাঝে নদীবাক সত্যিই নির্জন। সবুজের সমারোহে প্রকৃতি শুল্করীর অকুণ্ণ সহজ আশ্রয় তাকে বার বার আকর্ষণ করে আনে এখানে। তাই নদী বাক সঞ্জীবের পক্ষে আজ সব দিক দিয়েই প্রিয়। সময় পেলে একা একাও সে এখানে এসে বসে। জীবনের বহুঘাট পেরিয়ে এসে সে এমন একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছে, যেখানে নির্জনতার মধুর পরিবেশে স্মৃতি পটে অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত রকম দৃশ্য এখানে প্রতিফলিত; হুঃসহ সময়ও ধীরে ধীরে কেটে যায়। আজও বাকের নির্দিষ্ট জায়গাটাতেই চুপচাপ বসেছিল সঞ্জীব। বেশ কিছু দূরে চাপা কণ্ঠে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে কথা বলছিল অপরের। যুবকগুলি মহিমপুরেরই। এদের মধ্যে কয়েকজন পরিচিত, এ গ্রামের মাতব্বর গোছের।

নিজের চিন্তার জালে বার বার জড়িয়ে পড়ছিল সঞ্জীব। এমন সময় কিছুটা দূর থেকে এগিয়ে আসতে আসতে অপরের বললো, “সঞ্জীববাবু, শেষ পর্যন্ত কবি হয়ে যাবেন!” কথাটা কাণে যেতে সম্মিত ফিরে পেয়ে মৃদু হেসে শুধু অপরের দিকে তাকাল সঞ্জীব। ধীরে ধীরে নিকটে এসে সঞ্জীবের কিছুটা তফাতেই বসলো অপরের। সঞ্জীবের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে অপরের এবার জিজ্ঞাসা করলো, “কি এতো চিন্তা করছিলেন?” মৃদু হেসে সঞ্জীব বলল, “কিছু না।” “কিছু না মানে? একবারে ডুবে গিয়েছিলেন!” “ওনাদের সঙ্গে গল্প করছিলেন, এখানে এ বেচারী একা না বোকা, তাই ঝিমুচ্ছিলাম।” কথা শুনে হেসে উঠলো অপরের, তারপর বললো, “ছেলেগুলো এবার পূজোতে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে চায়, তার পূর্বপ্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করছিল।” “তাহলে পূজোয় কিছু হচ্ছে?” দেখা যাক, তবে আপাতত এটা একতরফা, অপর পক্ষের সম্মতির দায়িত্বটা ওরা আমার উপর দিতে চায়।” “সে তো ভালো কথা, আলোচনা শুরু ক’রে দেন।” “চেষ্টা তো করবোই, তবে ব্যাপারটা কি জানেন, মানে”—“মানে?” “গতবারটা এভাবেই ফেঁসেছিল।” গতবারও আপনার উপরেই দায়িত্ব ছিল?”

ক্রমশঃ

ইক্ষু সমুদ্র

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

জ্যোতিষ্ময় বাল্যোপাধ্যায়

প্রায়াক্ষকার প্রত্নাষে উত্তর দিগন্তে যেখানে এই পৃথিবীর শেষ, সেখানে অনেক উচুতে ধরণীর শিরে কুয়াশার বোরখা পরে গিরিরাজ হিমালয়ের পঞ্চভগিনী কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই মহার্ঘে উষালগ্নে তাদের রাত রং (লাল রং) মা অনুলেপন রাত আধিসম্ম মহাকালকো রুদ্রভাণ্ডবমাত্রই প্রকাশিত করছে (করছে)। অথবা ধ্যানমগ্না পার্বতী অনুচরবৃন্দসহিত তেজস্বিনীর রক্তিম বর্ণকো জ্যোতিবিকীর্ণা রঞ্জিত গাত্রমাত্রই ! স্বচ্ছফটিক সম্ম (মতন) তুষারধবল পর্বতের শিরে গগনচুম্বী পঞ্চভগিনী অন্ধকার ভেদ করি (করে) ধূসর কালা সৌসামাফিক নগ্নগাত্র রাত বাস্তব চাদর জড়িয়েছে এইমাত্র। এবং তুমার চিক্‌চিক্‌ চিক্‌মিক্‌ রূপোলী রশ্মিতে প্রকাশিত বয় (হচ্ছে)।

চকিতে ফুলমায়ার স্বপ্নই সম্ভব বলে মনে হল। যেন ধরণীর শয্যায় সে-ই শুয়ে রয়েছে ! উন্মুক্ত বক্ষ কি ফুলমায়ার ! সুউচ্চ দুটি বক্ষের কোটরে ওই তো উপত্যকার খাঁড়ি। ঠিক তেমনি সফেদ রংয়ে রঙ্গীন গায়ের চক্‌মকে রূপোলী রংয়ের তুলোট চামড়ার খানিক উচ্চতায়ই তো গগনচুম্বীর রক্তিমতায়ুক্ত আপেলপাকা রংয়ে যেন লালে-সোনালীতে মাখোমাখো ! আউর লিপ্‌ষ্টিক মণ্ডিত রক্তিম অধরওষ্ঠ ! তেমনি গলার নীচে বক্ষের চারিপাশে কিংবা তার আরও নীচে কর্পূরের গন্ধ-বর্ণযুক্ত গাত্র বরফকুচির মতন পঁজা দুধেল রং তুলোহেন মসৃণ নরম চিকন। ওই তার দিগন্তের কুহেলী আকর্ষণ ফুলমায়ার দেহের হস্তপদে অঙ্গুলীসূক্ষ্মাগ্রে গলদেশ হতে পৃষ্ঠে ও ক্রমান্বয়ে অধোগতিতে জাহ্নমিশ্রিত মোহের প্রাহেলিকা সৃষ্টি করে মরিচীকা ! না যায় যাওয়া সুদূর কান্‌চেন্‌জঙ্ঘায় না যায় ছোঁওয়া ফুলমায়াকো ! পুরাতন গাঁথামা এতই থিয়ো (এরাই ছিল) বুঝি অঙ্গরী কিম্বদন্তী ! তাহলে প্রায়াক্ষকার এ প্রত্নাষের পঞ্চভগিনীদের কি পরিচয় ছিল ! কেউ কি জানে তিন কি দশ হাজারো বর্ষমে ? আংরেজকো পাছি ই পাহাড়কো কোই ঠিকানাই থিয়ে না ! (ইংরেজদের পরে এ পাহাড়ের কোন ঠিকানাই ছিল না জানো !) বোটানিক্যাল গার্ডেনে আমরা শুয়ে আছি ঘাস বিছানো ঢালে।

ফর ফর করে যেভাবে চিন্তাভাবনাহীন কথাগুলো গড়গড় করে ফুলমায়া ওগড়াল এই শহর পাহাড় প্রাকারে উদ্ভিদ উদ্যানে শুয়ে—ধরতে সময় লাগল আমার ; বললুম, পাছি কি অগারী ? আংরেজকো অগারীকো ঠিকানা ভন্‌হুস্‌। (পিছে না আগে ? ইংরেজের আগের ঠিক ঠিকানা বল।)

—অ। ঠিক ছ ঠিক ছ। (এ ঠিক ঠিক।) ধাক্কা দিয়ে দিয়ে মুখের আওরাজের শব্দটা ফুলমায়ার গলায় থেমে গেল যেন। —সী—দ্রুতলয়ে উচ্চারণ করে বললে, আগারী - আগারী। (আগে আগে।)

কিন্তু অমন উর্বশীসম্ম পলাশ রাজা অধরওষ্ঠ যুগলে নেশা ধরায়। অনেকটা পশ্চিমাকাশের পাহাড়ের আড়ালে ঢলে পড়া সূর্যের গোখুলি নেশার মতই। তবুও মেঘে ছাওয়া এই উদ্ভিদ উদ্ভানটার হাওয়ায় বিন্দু বিন্দু জলকণার নীচে ঢালের ঘাসমাটিতে বৃষ্টি জারো (ঠাণ্ডা) লাগে, হাতের সূক্ষ্মাশ্র শুভ্রতামাখা আঙ্গুলগুলি সবকটা দস্তানা দিয়ে ঢেকে দেয়; আমিও টানি মাথার ওপর দিয়ে মুখের ওপর কাণঢাকা টুপিটা। কিছুটা আটকাতে পারি জারো। কেবল পারিনি চোখ দুটো আটকাতে অন্য দিকে অন্য কোথাও; স্থির অভিনিবেশে আবদ্ধ ফুলমায়ার বাতাসে গায়ে হাতে পায়ে চোখে মুখে অধর ওষ্ঠে। ওকে আগের চেয়ে ভাল লাগে অনেক বাধার মধ্যেও।

—ভন্সু? ভন্সু না? (বলো? বলো না?)

—খি ভন্সু? (কি বলবো?)

—কান্‌চেন্‌জঙ্ঘাকো কুরা (কথা)। খিলখিল হাসতে হাসতে লুটোপাটি যায়। সহসা ঘুরে এমন উন্টে যায় ঘুরে উবুড হয়ে শোয় নরম ভেজা মাটির ওপরেই নরম বুক রেখে—পুরু ঘাসের আস্তারনের সবুজ গালিচার ওপর—পেছন শরীরের নিম্নকটি নিতম্বটা বুক পিঠের চেয়েও অনেক উঁচু হয়ে ওঠে; সজ্জারে চাপড় লাগাট; সেটাই সে আশা কবেছিল; তবে চাপড়টা খেয়ে ফের গেল উন্টে, শুলো চিত্ হয়ে; সেট আবার দুটি শৃঙ্গের উচ্চতা চোখে ঠিকুরে আসে। ভন্তেই হয় অগত্যা। ভন্তে হয় কান্‌চেন্‌জঙ্ঘাকো কুরা; পঞ্চভগিনী কুন্তকণা জানো কাবর, ভালং কাক্ত, পাণ্ডিসিম্বো নরসিংয়ের কথা। তাদের কেউ যে ধরিত্রীর কাছাকাছি নয়, বরং আকাশের শুনোই ভাসমান সবই এরাজ্যের অক্ষয় সম্পদ! সেট প্রায়াক্ষকার প্রত্যাষে যা দেখেছি; প্রত্যাহ যাদের দেখি প্রতিদিন প্রাতে। অবশ্য দেখা গেলে পরিষ্কার থাকলে আকাশ, বায়ু নির্মল জলকণাহীন মেঘহীন থাকলেই। তখন গভীর অন্ধকার থেকে গাঢ় ধূসর ছাইবর্ণে দেখা, ধূসর থেকে খানিকটা কাল্‌চে সফেদ, তারপর রক্তিমলাল হয়ে উজ্জ্বল সোনালী থেকে ক্রমশ সূর্য উঠলে চক্কে রূপোঙ্গী শ্বেত মার্বেলপ্রস্তরে বানান মূর্তি-বিশ্বকর্মার অমূপম ভাস্কর্যলীলা।

—সচ্? (সত্যি?) প্রশ্নে সবটুকু হুঁমুভরা চোখের জিজ্ঞাসা মণিতে চোখের মায়ার।

সত্যি বলছি। তোমারও শরীরে রং নেই অতো। ওদের ভাষায় কুরা সবসময় বলতেও পারিনি। শরীরের কথায় লজ্জা পায় ফুলমায়া। কিংবা ভান করে লজ্জার বৃষ্টিতে ঠিক। আনত চক্ষুকে মোহিনীর ইন্দ্রজালে ভরে নিক্ষেপ করে, মেরো ছাই সোন্দর? এবার বড় বড় গোলগোল চক্ষু দিয়ে তাকায়। শব্দটা জানি, ছাই নয় চায়ী; উচ্চারণ জনিত শ্রবণ হয় ছাই।

—তিমিরো চায়ী না (তোমার চেয়ে নয়)—তুই মৌ করতেই হয় আমাকেও—তিমিরো মাফিক।
তখন আবার সে এক হাসির ধুম। সব করেই না কামনার আগুন পুরে দিলুম গলাটা টিপে
একবার, আপত্তি করল না ফুলমায়া; তবে এই প্রথম ক'বছরে গায়ে হাত দেয়া। কপটতা করল
রাগের ভান দেখিয়ে, ঋণিক গালতুটো ফুলিয়ে, অঙ্ককার মুখচোখ করে, বলল, লা—আ—;
হামুরো গায়েপানি হাত দিবে কোছু! (আমার গায়ে পর্যন্ত হাত দিয়েছ!)

—গালে মাত্রই, গায়ে ছাই না।

—গণ্ড মাত্রই? গণ্ড কি শরীরমা হোই না?

—হোই হোই, আগুনটা নেভাতে চেষ্টা করি; দোষ হয়েছে? দোষ বয়?

—অ। বয়। আঁচল শরীরে জড়িয়ে বসল মায়া।

পিঠ জুড়ে ডান হাতটা বেড়িয়ে কাছে টেনে নিলুম, বাধা দিলে না, আমার কোলের ভিতর
শুইয়ে দিলুম আপত্তি করল না, ফের জোরে জোরে গাল তুটো টিপে দিলুম ক'বার-চোখ বুজে নীরবে
উপভোগ করল দেখে বললুম, কি দোষ বয়?

কুকুরছানার মত আদর খেয়ে বললে, জান্দাই না ম। (জানিনা আমি।)

এক মুখ ভরা অভিমান নিয়ে উঠে বসল হঠাৎ। পরনের পলিমেটোবের শাড়িটা ওর
দেহেরই চাপ লেগে মাটিতে ভেজা ঘাসে একদম ভিজে গেছে। যে সাদাকাল উড়ো মেঘটা
জলকণায় ওকে মাটিতে ভিজিয়ে দিয়ে গেছে, গাছপালা ঘরবাড়ি পাকপথ বাটো সব। —ভারো
বুঝি লাগ্দাই না তিমিরো? (ঠাণ্ডা লাগছেনা বুঝি তোমার?) পাছু মা শাড়ি একদমই ভিজি
গয়। (পেছনের শাড়ি একদম ভিজে গেছে।)

কি ভেবে সহসা খিল খিল হেসে উঠল ফুলমায়া। হাসতে হাসতে প্রায় অট্টহাসি।
গায়ের ওপর আমার গড়িয়ে পড়ে আর কি। খোলামেলা বাগানে বাটোতে (পথেঘাটে) দিলখুলে
খোলামেলা বাত্‌চিৎ করলে কেউ এখানে কিছু মনে করে না ভাবেনা। তাকায় না পর্যন্ত
মুখচোখ ফিরিয়ে। যেন স্বাভাবিক, হামেশা এমনটি হয় হতে পারে, চোখ পড়লে বা চোখ
ফিরিয়ে নিয়ে সহজভাবে সহজ হয়েই হেঁটে যাবে লোকে; উন্মুক্ত পাহাড়ের উদার বলে, আবার
কাজে মেশিনের মতন আচরণও করে।

—মায়া।

—অ—

—তিমি ফুলকো মায়া।

—কেডিন কবিলে কোইলে লিখেকোছু? ওর মুণের বোল্টা বোল্‌তার জল বেঁধাল বুকে।
গলার স্বরে রাশভারি ভারিকীয়ানা অমন কোমলকান্তি বিগলী গোলাপসম্ম চেহারায় যেন বড় বেমানান

লাগে। লাগে লাগুক, কিন্তু বৃক্কের মধ্যে কোথায় প্রাপটা কোমলতায় ভরা। ব্যটা ছাওয়ালেরা মাথায় করে রাখবেই ছোঁড়ীরা যা ব্যাভারই করুক না কেন? এই জীবনটা এদের খেলামাত্র, গুরুত্ব দিলেও হয় না দিলেও কিছু নয়। সহবাসটা অভ্যাস। একজনার জীবনের বাঁধন থেকে খসে পড়ে অন্যজনার সঙ্গে গাঁটেছড়া বাঁধলে আবার তখন একেবারে নূতন মানুষ। অনাত্মাতা কুমারী। কোন ছাপ প্রতিচ্ছবি নাই পূর্ব সংসারটির।

আবার একটা ধূসর মেঘ পায়ের অনেকটা নীচে পুঞ্জীভূত হয়েছে। চাঁদনীর বরাবর সোজা নিম্নপাহাড়ের বুক জুড়ে বাদামতাম টী এস্টেটের বাগানের মাথায়। উড়ে এসে ওখানে জুড়ে বসেছে জল ঝরাবার নামে নাকি ওখানকার মাটি গাছপালাথেকেই উঠে এসেছে, সেটা লক্ষ্য করিনি। এই সব চোখে পড়ল আমার। বেশ দূরত্বে হলেও হয়ত যে কোন মুহূর্তেই ওপরে উঠে ভিজিয়ে চুপসে দিয়ে যাবে আমাদের। কয়েক লহমার মধ্যে কোন উঁচুতে উঠে ভেসে চলে যাবে জলাপাহাড়ের শিরষে কিংবা টাইগার পাহাড়ের দিকে। রেখে যাবে চিহ্ন হার পত্রেপল্লবে বৃক্ষশাখায় ছোট ছোট গুলো লতার মাটিতে এবং মানুষের গাত্রাবরণে গাত্রাবরণে। আমি জানি, আমার চামড়ার বিলতী লম্বা কোটটা পর্যন্ত ভিজে ঘেমে থাকবে বাইরেটায়। তবু কি জায়গা ছেড়ে নড়তে পারি? নেশা, প্রবল নেশা ধরিয়ে সে উচু বুকটা নিয়ে সগর্ব অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। এ মোহ এ মোহের আকর্ষণ ওই পসলা পসলা বৃষ্টির ফোঁটার চেয়েও ভারী। তা নইলে ওই তো খানিক উঁচুতে অফিস বাড়ির চালাঘরটার নীরব শাস্ত ফাঁকা বারান্দাটা স্পষ্ট হাতছানি দেয়; যেন ডাকছিল ঠিক। এই গার্ডেনের অফিস, অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গেছে। নাঃ, ভুল হল; এদের বৃষ্টি ছুঁতে আগে খুলে ছুঁতে আগে বন্ধ হয়। আমাদের মত দশটা পাঁচটা নয়। আমাদেরো ক্ষণে ক্ষণে ক্লাশ ক্ষণে ক্ষণে অবসর। পা সরছে না এই মাটির আর ওই আকাশের বুকজুড়ে ফুড়ে ওঠা শৃঙ্গের জগ্রে প্রতি প্রত্যাষে যেমন লেবং রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ে খানিক রেলিংটা ধরে। তাকিয়ে থাকে নীলগগনের দিকে কান্চেনজঙ্ঘার উঁচু উঁচু শৃঙ্গগুলির দিকে; প্রধানকে ঘিরে অগ্রধানদের অবস্থান। যতক্ষণ না কালো মেঘে ছেয়ে কেল আকাশের উত্তরাংশ, ঢাকা পড়ে পূর্বের প্রচণ্ড শক্তিশালী রক্তাক্ত আগুনের উৎসটি।

ক্রমশঃ

জাগর দুহিতা

(বখা চাটোপাধ্যায়)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৬৪ সালে ভারত সরকার এই উপনিবেশ নিজের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসেন। এবং বার্মার চীফ কমিশনারের হাতে প্রশাসন তুলে দেন। ১৮৬৭ সালে মেজর এইচ নেলসন ডেভিস আন্দামান উপনিবেশ পর্যবেক্ষণে আসেন তাঁর সুপারিশের মধ্যে বন্দীদের কিছু পুষ্টিকর খাবার ও ৪৫ বৎসরের উপরে যাদের বয়েস সেই সব বন্দীদের আন্দামানে না পাঠাবার সুপারিশটা গ্রহণ করা হয়।

১৮৭০ সালে আন্দামানের বিচার ব্যবস্থা কলকাতা হাইকোর্টের আওতায় নিয়ে আসা হয়— এবং আজ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে।

১৮৭২ সালে ভারতের ভাইসরয় গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো আন্দামানের বন্দী নিবাস পরিভ্রমণে আসেন। মাউন্ট হ্যারিয়েটের চুড়া যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত বন্দীদের জন্য একটি স্বাস্থ্য নিবাস তৈরীর কাজে খুবই উৎসাহী ছিলেন। ১৮৭২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি নিজের জায়গাটা দেখতে যান—তাঁর এখানটা এতই ভাল লেগে যায় যে এখানে নানাধরনের পরিকল্পনার কথা আলোচনা করতে করতে প্রায় সন্ধ্যা নেমে আসে—এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে জেটির কাছে শের আলি নামে এক বন্দী তাঁকে ছোরা মেরে খুন করে ফেলে। শের আলিকে বন্দী করে ভাইপার দ্বীপে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়।

এর পর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব জে স্ফাংলেট ক্যাম্পবেল কার্য প্রণালী পরিদর্শনে আসেন তিনি এসে বন্দীদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেন—

৪র্থ শ্রেণী—সমস্ত বন্দীকেই প্রথম দিক এই শ্রেণীভুক্ত করা হত—এক বছর সন্তোষ জনকভাবে কাটালে তখন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করা হত। জেলখানার একটি পৃথক অংশে অমানুষিক পরিশ্রম করে এবং নামমাত্র খাবার খেয়ে কাটাতে হত—তাদের জন্তু কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখা হত। আরামের কোন সুযোগ ছিল না—এবং যে কোনো অপরাধে চাবুক মারা হত নতুবা নির্জন প্রকোষ্ঠে আটক রাখা হত।

তৃতীয় শ্রেণী—এই শ্রেণীর বন্দীদের সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত আর রাতে ব্যারাকে আটকে রাখা হত। এরা জেলের রেশন ও পোষাক পেলেও কোন নগদ টাকা পেত না—এখানে পাঁচ বছর সন্তোষজনক ভাবে কাটাতে পারলে তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পাওয়া যেত।

দ্বিতীয় শ্রেণী—এখানেও বন্দীদের রাত্রে ব্যারাকে আটক রাখা হত এবং দিনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত। জেলের রেশন ও পোষাকের সঙ্গে আট আনা থেকে এক টাকা হাত খরচ পেতে পারত তাই দিয়ে তারা সব্জি বা তামাক কিনতে পারত—এখানেও পাঁচ বছর সুস্থভাবে কাটাতে পারলে তখন প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারত।

প্রথম শ্রেণী—এই শ্রেণীর কয়েদীরা ব্যারাকে অথবা সুপারের ইচ্ছামত অন্য কোন জায়গায় আটকান থাকত। তারা শুকন খাবার ও হাত খরচের জন্য এক বা দু টাকা পেত তবে পোষাক পেত না তা তাদের নিজের জোগাড় করতে হত। এই শ্রেণীর সকল বন্দীকেই স্বনির্ভর বলে ধরা হত না—কেবলমাত্র যারা জীবিকা অর্জনে মুন্সিয়ানা দেখাতে পারত যা থেকে বৃদ্ধ বয়সে বা অসুস্থ্য হলে পড়লে অন্য কেউ তার উপর নির্ভর করতে পারে তাদেরকেই স্বনির্ভর বলে বলে ধরা হত এবং এদেরই বিয়ে করবার অধিকার দেওয়া হত।

মেয়ে কয়েদীদের মোটমাট দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হত প্রথম এবং দ্বিতীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পুরো তিনটি বছর কাটাতে হত। এখানে সম্ভাব্য জনক রিপোর্ট থাকলে তবে প্রথম শ্রেণীতে যাওয়া যেত। এখানেও আবার দু বছর নিয়মমত থাকলে তখন তারা বিয়ে করে সংসার করতে পারত।

একের পর এক রাজপুরুষ কর্মভার নিয়ে আন্দামানে এসেছেন এবং কেউ কেউ পরিদর্শনের কাজেও এখানে এসেছেন—কিন্তু মোটামুটি ভাবে প্রায় সকলেই বন্দীদের সম্বন্ধে কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাগ ব্যবস্থা করেন নি—এদের প্রতি নির্মম অত্যাচারের ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় বহাল ছিল। বন্দী সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে থাকে এর ফলে স্থানভাব দেখা দিতে থাকে।

১৮৯৬ সালে লায়াল ও লেথব্রিজের সুপারিশে কুখ্যাত সেলুলার জেলের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং এটি শেষ হয়েছিল ১৯১০ সালে। এই সময়ই ভারত সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের এখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন—ফলে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি এবার আন্দামানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

প্রথম দিকে আন্দামান উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিরাপদ পোতাশ্রয় এবং দুর্ঘটনা-গ্রস্ত জাহাজের নাবিকদের আশ্রয় দেওয়া থাকলেও কালক্রমে সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়—তবে তখনও অপরাধী নিবাসের প্রয়োজন দেখা দেয় নি—তবে এর বহু আগে থেকেই বন্দীদের দ্বীপান্তরে পাঠানোর ক্ষেত্রে সুমাত্রার বেনকোলেন, পেনাঙ্গা, মালাঙ্গা, সিঙ্গাপুর এবং বার্মার মৌলমিনে পাঠানো হয়েছিল। প্রথম দশকে বেশ কিছু বন্দীকে নিয়ে গিয়ে আন্দামানের জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে লাগান হয় কিন্তু বেশীদিন এ কাজে তারা বহাল থাকে নি এর মূল কারণ তখন পোর্ট কর্ণওয়ালিশ থেকে ইংরাজকেই পাত্তাডি গুটোতে হয়েছিল।

বিস্তৃত ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় অনেক রদবদল করতে হয়—হাজার হাজার নরনারীকে সিপাহী বিদ্রোহের সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে হত্যা করে, দেশের মাটিতে জেলে আটকে রেখে অত্যাচার করেও যখন সামাল দেওয়া যাচ্ছিল না তখন তাঁদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক বন্দী করে পাঠানো হল আন্দামানে। এইভাবে শুরু হল আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দী আসার পাল।

বিদ্রোহী সিপাহীদের দ্বিতীয় দল হিসাবে আন্দামানে নির্বাসিত করা হল ওয়াহাবি আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিদ্রোহীদের। ১৮৮২ সালে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এক বিরাট দল পোর্টব্ল্যারের বন্দীশালায় এসে পৌঁছয়। ১৮৯০ সালে মণিপুর বিদ্রোহের নাযক সেনাপতি টিকেন্দ্রজিত ব্রিটিশ শাসনের অধীনতার নাগপাশ থেকে স্বাধীনভাবে পতাকা উত্তোলন করেন। ফলে ইংরাজের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে এবং পরিণামে শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হন—এই যুদ্ধের বন্দীদের এবার আন্দামানে পাঠানো হয়। ১৯০৭—১৯০৮ সালে স্বরাজ্য পত্রিকার রামহরি জ্যোতিলাল ভার্মা, সাধুবাম এবং নন্দগোপালকে রাজদ্রোহীতায় উদ্ভূত নি দেওয়ার অপরাধে আন্দামানে পাঠানো হয়। এছাড়া আরো কয়েকজন সাংবাদিককে আন্দামানে পাঠান হয়—গুজরাটের লোঠারাম কাপুর। তাঁর অপরাধ জনৈক ভারতীয় মহিলা ইংরাজ পুরুষ কতক লালিত্বিত হলে তা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং যুগান্তরের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে বাংলার রামচরণ লালও আন্দামানে নির্বাসিত হন।

১৯১০ সালে খুলনা ষড়যন্ত্র মামলার এগার জনকে দোষী সাব্যস্ত করে আন্দামানে পাঠান হয়। সমসাময়িক সময়েই মানিকতলা বোমার মামলার আসামী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, হেমচন্দ্র দাস, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতি ভূষণ সরকার, হৃষিকেশ কাজীলাল, সুধীর কুমার সরকার, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন আন্দামানের কারাগারে পাঠানো হয়।

এছাড়া ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা মামলা, ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলা এবং রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে তরুণদের সকলকেই আন্দামানে শাস্তি ভোগ করতে পাঠানো হয়।

নাসিক মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে বিনায়ক দামোদর সাভারকর, গণেশ দামোদর সাভারকর এবং ওয়ামান ওরফে দাজি।

এখানে এসে তাঁরা সেলুলার জেলে আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের সঙ্গে মিলিত হন। এখানকার অত্যাচারের কাহিনী প্রথম প্রকাশিত হয় সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত বেঙ্গলী পত্রিকায়। এছাড়া বীর সাভারকর বারীন ঘোষ এবং উপেন ব্যানার্জী তাঁদের লিখিত গ্রন্থে এখানকার অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বন্দীদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদে জেলে অনশন শুরু হয়—চীফ কমিশনার এইচ এ ডাউনিং ছু বেলা নল ঢুকিয়ে জোর করে তাদের খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। ননীগোপাল

মুখার্জী ৭২ দিন অনশন করেছিলেন—যারা অনশনে যোগ দেয় নি তারাও এর সমর্থনে কাজ বন্ধ করে দেয়। অবস্থার চরম পরিণতির কথা ভেবে স্যার পার্শী লুকাস রাজবন্দীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের হাঙ্গা কাজের প্রতিশ্রুতি ও সেলুলার জেলের বাইরে ঘাবার অনুমতি দেন। তবে সেই অনশন ভঙ্গ হয়। কিন্তু লালমোহন নামে এক বন্দী রাজনৈতিক বন্দীদের পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ও বাস্তুক্যাট নামে জায়গায় বোমা পরীক্ষা করার খবর ইংরাজ সরকারের গোচরে নিয়ে আসে—ফলে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে কঠোর হাতে শাসন করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

এই সময় ভারতে এই সেলুলার জেলে বন্দীদের উপর অত্যাচার নিয়ে জনমত গঠিত হতে থাকে—আন্দামানের ভেতরে ও বাইরে একই সঙ্গে আন্দোলন চলার ফলে অবস্থার সামান্য দিতে স্তার রেজিন্যাণ্ড ক্রাডোক আন্দামানে আসেন সরেজামিন করতে কিন্তু কিছু মত বন্দীদের অনুকূলে দিলেও ভারত সরকার তা গ্রহণ করেন না—ফলে ১৬ জন বন্দী কাজ বন্ধ করে দিলেন—ফলে তৎকালীন চীফ কমিশনার জে হোপ সিম্পসন বুঝতে পারেন যে যত কঠিন ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক বন্দীদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এই ধর্মঘট চলাকালে নির্দিষ্ট মেয়াদী রাজনৈতিক বন্দীকে স্বদেশের জেলে ফেরৎ পাঠানো হল।

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি যে ধরনের দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার চালান হত তাতে কর্তব্যবত কিছু ইংরাজ কর্মীও মর্মহত ছিলেন। যাইহোক ঠিক হল ১) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নয় অথচ নির্দিষ্ট মেয়াদী এমন বন্দীদের স্বদেশের জেলে ফেরৎ পাঠানো হবে এবং সেইখানেই নিয়ম মত তাঁদের দণ্ড মকুবের কথা ভাবা হবে।

২) যাবজ্জীবন দণ্ড ভোগীদের ক্ষেত্রে যারা সদাচরণ করবেন তাঁরা চৌদ্দ বছর পরে সেলুলার জেলের বাইরে হালকা কাজে নিযুক্ত হবেন।

৩) এই চৌদ্দ বছর তাঁদের ভাল খাওয়া দাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে এবং পাঁচ বছর পার হলে তাঁরা নিজেরাই রান্না করতে পারবেন এবং মাসে বারো আনা থেকে একটাকা হাত খরচ পাবেন।

আন্দামানের অবস্থা মন্দের ভাল হল বলা যেতে পারে। ঠিক এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়—আর অল্পদিনের মধ্যেই লাহোর মামলার অভিযুক্তরা এসে আন্দামানে হাজির হলেন।

১৯১৫ সালে গদরের সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে যে সব শিখ বিপ্লবী এসে আন্দামানে পৌঁছন তার মধ্যে অধ্যাপক ভাইপরমানন্দ। তিনি যখন জেলে এসেন তখন জেলার ছিলেন কুখ্যাত ব্যারি। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পরমানন্দ ও আশুতোষ লাহিড়ী তাকে মেঝেতে ভুলে আছাড় মেরেছিলেন। এর ফলে ফাগিং ট্র্যাণ্ডেলে আটকে চাবুক এবং বেত মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন। এই ঘটনা এবং তারপর ভানসিংকে অস্বাভাবিক প্রহারের প্রতিবাদে ব্যারীর বিরুদ্ধে বন্দীরা গর্জে ওঠেন। ধর্মঘট আরম্ভ হল—অংশ নিলেন প্রায় ১০০ জন। দীর্ঘ বারদিন পরে আশা / চৈত্র সংখ্যা—২৪

কতৃপক্ষ তাদের দাবী মেনে নিল। এর কিছুদিন পরে আবার পণ্ডিত রামরক্ষা নামে একজন পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণকে উপবীত খুলে নেওয়ার প্রতিবাদে নিরস্ত্র অনশন শুরু হয়। জোর করে খাওয়ানর চেষ্টায় তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছুদিন পরে মারা যান।

এইভাবে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অত্যাচার যেমন-অবিরাম ধারায় চলতে থাকে তেমনি প্রতিরোধ আন্দোলনও থেমে থাকেনা। আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীদের আগমন অব্যাহত থাকে। এই সময় বহু চেষ্টায় জেল কমিটি গঠিত হয়। ভারতের মূল ভূখণ্ডে আন্দোলন অব্যাহত চলতে থাকে—তীব্র আন্দোলনের প্রভাবে ভারত সরকারের টনক নড়তে বাধ্য হয়—ফলে পরমানন্দসহ বহু রাজনৈতিক বন্দী “রাজকমা” পেয়ে মুক্তি পান। কিন্তু সাভারকরসহ আরও প্রায় ৩০০ জন বন্দীকে সেলুলার জেলেই আটকে রাখা হয়। পরে সাভারকার ভ্রতুরয় ও অন্য কয়েক জনকে Ticket of leave prisoner হিসাবে সেলুলার জেলের বাইরে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর ১৯২১ সে আন্দামানে নতুন করে রাজনৈতিক বন্দী নিবাস পরিভুক্ত ঘোষণা করার কথাও ভাবা হয়। কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন জেলে স্থানান্তার হওয়াতে পুনরায় আন্দামান জেলের কথা ভাবা হতে থাকে।

ক্রমশঃ

সম্পাদিকার কথা—

আমরা পত্রিকার “অষ্টাদশ বর্ষ” শুরু হল—প্রথমেই সকলকে যথাযোগ্য প্রশ্নাম নমস্কার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। এগিয়ে চলার পথে সকলের শুভ কামনা চাই—চাই সহযোগিতা।

আজকাল একটা বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা-আলোচনা, সভা সমিতি অত্যন্ত চালু হয়েছে। বিষয়টা ‘জাতীয় সংহতি’। কথাটা প্রথমে শুনে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে বাধ্য। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আজ আহ্বান জানান হচ্ছে। ভাবতে গেলে অবাক লাগে যে দেশের কবি একদিন গেয়ে ছিলেন “শকু হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন” সেখানে নতুন করে বলবার মত নতুন কথা কি থাকতে পারে? স্বামী বিবেকানন্দের মতে জাতপাতের সীমাটা ভেঙে ফেলতে হবে তবেই আমরা মানুষকে প্রকৃত মানুষের মর্যাদায় গ্রহণ করতে পারব।

বর্তমানে রাজনৈতিক মহল থেকেই জাতীয় সংহতির জীগির তোলা হচ্ছে—তাই মনে হতে পারে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই এই প্রচার চালান হচ্ছে।

আমাদের পূজার মন্ত্রে যখন পূজারী পূজার আসনে বসে দেব পূজার উদ্দেশ্যে জল শুদ্ধি করতে যান তখন তাঁকে উচ্চারণ করতে হয় ‘গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরী সরস্বতী’ ইত্যাদি অর্থ্যাৎ আমরা ভারতের সব নদনদীর জল একত্রীত করে তবেই দেব পূজা করা যায়। নতুবা পূজা সিদ্ধ হবে

না। এমন করে সকলকে একীভূত করার কথা পৃথিবীর কোন দেশ কখনই ভাবতে পারে না। সকলকে এক সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যাবার মন্ত্র ভারত চিরদিনই বলে এসেছে এবং কাজেও করেছে।

কিন্তু এই সঙ্গে আজকে মনে হয় ভারতের এই একীকরণের পরিকল্পনাটা আজ আর বোধহয় পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আমাদের জীবনধারা বদলে গেছে—আজ আমরা বড় বেশী আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি। আমি ও আমরা ছাড়া আর কারো কথা ভাববার সময় নেই ইচ্ছাও নেই। তাই একাগ্রবর্তী পরিবার আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। ভাই ভাইকে সহ করতে পারে না - নিজের প্রয়োজনেই পৃথক হয়ে গেছে। বৃদ্ধ পিতামাতা ঘাড়ের বোঝা তাই বৃদ্ধা নিবাসে তাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এহেন মানসিকতার মধ্যে বাস করে মাঠে ময়দানে জাতীয় সংহতির কথা চড়া গলায় বলবার অধিকার আমাদের আছে কি? যেখানে নিজের আত্মকেন্দ্রের সঙ্গে আমরা একীভূত হতে পারলাম না সেখানে জাতীয় ক্ষেত্রে এক হবার ইচ্ছাটা নিতান্ত কথার কথাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমরা অনেক বড় বড় কথা বলতে পারি কিন্তু কার্যতঃ সবকিছু মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না।

মানুষকে ভালবাসতে আমরা ভুলে গেছি সবসময় স্বার্থ চিন্তায় ডুবে থাকার ফলে আমরা যা চাইছি তা পাচ্ছি না—সকলে মিলে মিশে থাকলে যে আনন্দ পাওয়া যেত যে তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব আমরা তা থেকে বঞ্চিত। নিজেকে দিয়েই অন্যকে বিচার করতে হয় আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গী যদি সীমিত হয়ে পড়ে তবে অণুর কথা ভাবব কি করে? আমাদের শাস্ত্রে আছে 'আত্মনং বিদ্ধি'—সেই আত্মসাধনার পথেই হবে জাতীয়সংহতি না হলে শুধু মুখের কথাই হবে প্রেম-প্রীতির বন্ধনে সকলকে এক করা যাবে না।

* * * * *

গত ১৫ই মার্চ আমাদের প্রিয় সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদা শঙ্কর রায় বিরাশি বছরে পদার্পণ করেছেন। শ্রীভগবান তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন।

ছেলেমেয়েদের সুপরিচিত সচিত্র মাসিক পত্র

রা ম ধ নু

১৩৯৫ সালে ৬১ বছরে পড়ল।

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের এমন দিক্‌পাল লেখক কমই আছেন যিনি রামধনুর জন্ত কলম ধরেন নি।

সম্পাদক—অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

বার্ষিক মূল্য পনেরো টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.২৫ টা:

কার্যালয় :

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-৭০০০২৫।

একটানা ষাট বছরের দরজায় পৌঁছে রামধনু তার অক্লান্ত শুভানুধ্যায়ীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

ঢলার গথে বলার কথা

বহুদর্শী

স্যাটানিক ভার্সেস পড়িনি; ক'জন পড়েছেন জানিনে। আমাদের বেদও ক'জন হিন্দু যে পড়েছেন জানা নেই। কিন্তু আজকেও যদি কোন স্বেচ্ছায় সভ্যতার মতো কোন পুরোহিত তত্ত্ব যদি পাঠাড শীর্ষের মন্দির সোপান থেকে হাজার ধর্ম অপরাধীর বক্তব্য বইয়ে দেয়, মানব সভ্যতা তাকে স্বীকার করবেনা। তেমনি স্বীকার করবে না অনড় রক্ষণশীলতা গোড়ামী।

ঈশ্বর বা আল্লাহ কি মানুষকে খুন করতে লিখিয়েছেন, না কি ভালবাসতে? ধর্ম তো মানুষের চরিত্র, ঈশ্বর সে চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ। পড়িনি, বুধ্দি সেই মানবের ঈশ্বরকে না চরিত্রকে অপমান করেছেন। চরিত্রে গলদ সকলেরই আছে; কি হিন্দুর কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমানের। সুরাপান ইসলামে গুনাহ্। এই যে দুই ইসলামী সভ্যতা-ইরান-ইরাক মরণপণ যুদ্ধ করল, এটাও কি কোরাণ সম্মত? নয় বোধ হয়। ঈশ্বর-ভূষণ মহামান্য বুদ্ধের মতাদর্শও নেই, তথাপি তিনি হিন্দুর কাছে বিষ্ণুর নবম অবতার! হিন্দু জানে, সকলই ঈশ্বরময়। এমন কি স্বয়ং খোমেইনী সাহেবও। তাহলে?

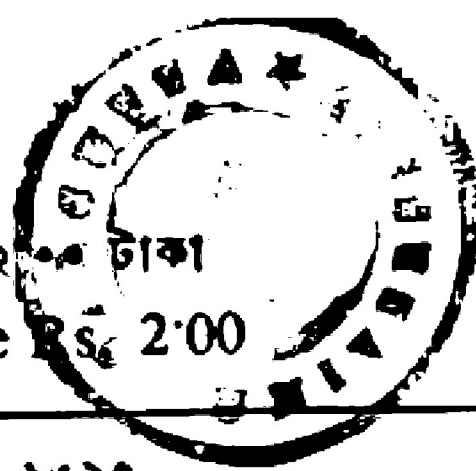
ইসলামও প্রেম ও মৈত্রীর ধর্ম। মহান কোরাণেরও বাণী 'সর্বং খুলিদং আল্লাহ্'। সেদিক থেকে দেখলে সলোমন বুধ্দীকে ইসলামের চার্বাক মনে করলেই তিনি ক্ষমাই হয়ে যান। আজ পর্যন্ত বিশুদ্ধ মুসলমানগণ মহাপুরুষ হাসান ও হুসেনের জন্য বুক চাপড়ে কাঁদেন। সম্রাট ক্যানিউট, সমুদ্রকে ধামতে বলেছিলেন—বলেছেন ফিরে যেতে। তা কি শুনেছিল সমুদ্র?

আমরা মানুষের শুভবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করবো।

• • • • •

প্রতি বছরই দেখি, রাজা ও কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে সংবাদ পত্রগুলি এবং অণু গণমাধ্যমগুলি বেশ কিছুকাল প্রচুর সময় শ্রম ও অর্থ অপচয় করে থাকেন। আসলে কি এর প্রয়োজন আছে কোন? পাঠক চিন্তা করে দেখুন, গোটা বাজেট নিয়ে কেউ কিছু মাথা ঘামান না। ধনীরা তাদের স্বার্থ নিয়ে, মধ্যবিত্তেরা ট্যাক্স বেহাট ও বাড়তি আয় নিয়ে এবং ব্যবসায়ীরা কত মুনাফা কমবে-বাড়বে অথবা কত আর কাল টাকা বৃদ্ধি হবে বা সঙ্কুচিত হবে—এই নিয়েই মৌতুহলী। গৌরী সেনের টাকা কত এল কত গেল নর্দমায়, কত খতিয়ানের খাতায় অলিখিত থাকল, তা নিয়ে সাধারণ নাগরিক তো দূরের কথা—একজনও অর্থনীতিবিদ কখনো ভবিষ্যদ্বাণী বা হুসিয়ারী দিয়েছেন? না, দেননি।

সুতরাং বাজেট যখন গদীনাসীন সরকারের এবং ট্যাকশাল ও ট্যাকও তাঁদেরই তখন সাধারণ পাঠকের কিছু আনন্দের খোরাক কেন নষ্ট করা! পড়েনা কেউ, একমাত্র অর্থনীতির ছাত্র ও অধ্যাপক ছাড়া। সবাই ভেনেছে, কোন বাজেটেই আর কোনদিন আগের দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনবে না—টাকা মাটি মাটি টাকা—সুতরাং বাজেটও মাটি মাটিই বাজেট!



মূল্য ২.০০ টাকা
Price Rs. 2.00

আভা—ABHA

Regd. No. WB/SC 73

R. N. 18638/72

26 APR

চৈত্র—১৩৯৫

March—1989

নব ব্রিক্‌ড

(মহিলা—আবাস)

৩১, চাণ্ডীঘাট রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০

১/২, রডক্রস্ প্রেস, চেন্নাই, কলিকাতা-১৭

কেবলমাত্র বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যে, স্বল্পবায়ুে সবনিম্ন
সুবিধাসহ থাকে-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পরিচালনায় :—

উদ্যোক্তা, কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল

৫/১, রডক্রস্ প্রেস, কলিকাতা-৭০০০০১

পরিবাল্য মহিলা নিবাস

ছাত্রী ও কর্মবতী মহিলাদের

আবাসিক ব্যবস্থা আছে।

ফোন : ৪৭-৮১৭২

মিশন হোমিও ক্লিনিক

৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬।

ডাঃ জি, ডি, চ্যাটার্জী

জাতীয় বনোষধী হইতে বিভিন্ন

ঔষধিওপ্যাথিক ঔষধের আবিষ্কারক।

সাক্ষাতের সময় :

সকাল ৯টা—১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা—৮টা।

ফোন : ৪৭-৮১৭২

চেন্নাই : ৪৭-৬৮৬৮

ল্যান্ডডাউন মার্কেটের বিখ্যাত মৎস্য ব্যবসায়ী

শ্রীমধুসূদন রায়

নিবাসে আপনাকে উৎসর্গে কিনা নিজে প্রয়োজনে সকল
রকম মৎস্য চাখা মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

যোগাযোগ করুন :

মৎস্য পাট্রি ১তম ফ্লোর, ল্যান্ডডাউন মার্কেট

To :—

Sri/Sm The Librarian

Central Library

The University of Calcutta

College Square

Calcutta - 12

নারী সেবা সংঘ

১/১/২এ, গড়িয়াহাট রোড, ঘোষণা পার্ক,

কলিকাতা-৭০০০৬৮

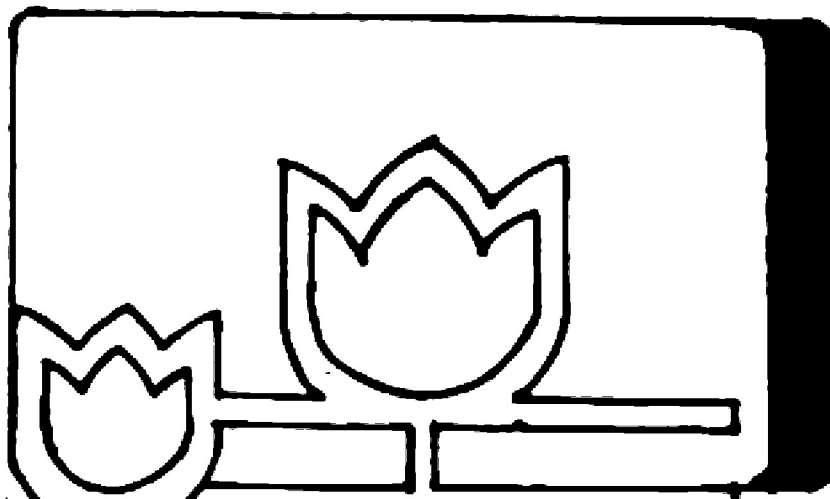
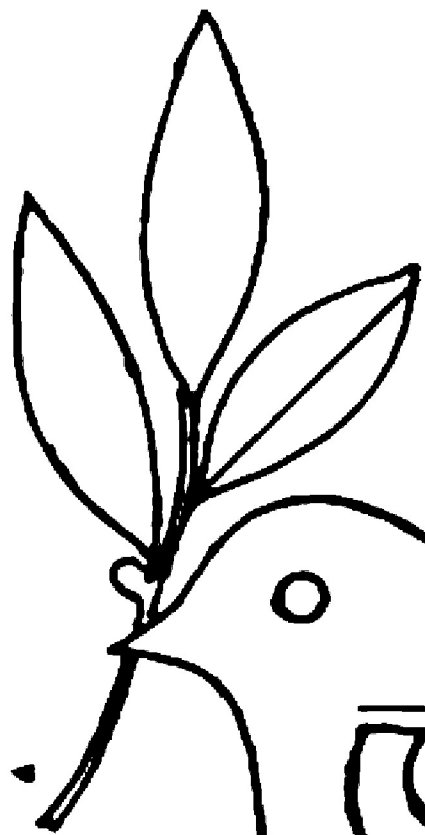
সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

ছাত্র মেয়েরা হোমে থেকে নানা ধরনের জাতের কাপড়ের
শিক্ষা পায়। এ ছাড়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং স্কুলে
স্বল্প বেতনে মেয়েরা নানা হস্তশিল্প শিখতে পারে
এবং ক্যাটিন সব রকম খাবার সরবরাহ করে থাকে।

প্রকাশক :—শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়, ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬।

মুদ্রক :—বৃদ্ধা আর্ট প্রেস, ৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২০।

ফেরৎ পাঠাতে হলে প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠাবেন।



আজ

মাসিক পত্রিকা

অষ্টাদশ বর্ষ

বৈশাখ সংখ্যা

১৯৯৬

সম্পাদিকা - রেখা চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

হিন্দী সাহিত্যে বাঙলা ও বাঙালী—নিখিলানন্দ ঘোষ	২৭
কোথায় গেলে পাবে কেহ (ধারাবাহিক উপন্যাস)—শোভনা সেন	৩০
ইক্ষু সমুদ্র (ধারাবাহিক উপন্যাস)—জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪
পরিচয় (ধারাবাহিক উপন্যাস)—সুনীল কুমার মণ্ডল	৩৮
কিন্তু (গল্প)—আদিত্য নাথ মুখোপাধ্যায়	৪১
অমরত্ব (কবিতা)—সরোজ কুমার পাণ্ডে	৪৪
মুখর (কবিতা)—কেশব ভট্টাচার্য	৪৭
সাগর ছহিতা (ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী)--রেখা চট্টোপাধ্যায়	৭৫
সম্পাদিকার কথা—	৪৮
চলার পথে বলার কথা—রত্নদলী	৫৯

সম্পাদিকা : রেখা চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক : ডাঃ গোবিন্দ দাস চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রণ : কৃষ্ণা আর্ট প্রেস

প্রচার : জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণে—দিগন্তর দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান : আভা কার্যালয়—৭৩সি. শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৭-৮১৭২

সম্প্রতি যারা আভাবিত গ্রাহক হয়েছেন :—

- ১। শ্রীভবানী প্রসাদ দত্ত
- ২। শ্রীমতী মালী বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৩। শ্রীদিলীপ কামুনগো
- ৪। শ্রীমতী শিউলী মিত্র
- ৫। শ্রীডাঃ সুদর্শন চক্রবর্তী
- ৬। শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়

অষ্টাদশ বর্ষ

দ্বিতীয় সংখ্যা



বৈশাখ
১৩৯৬

April
1989

ভদ্রাসা মা জ্যোতির্গময়

॥ হিন্দী সাহিত্যে বাঙলা ও বাঙালী ॥

নিখিলা তন্দ্র (ঘোষ (দুর্গা))

হিন্দী পড়তে আরম্ভ করে দেখা গেল, গদ্য-সাহিত্যে তথা জ্ঞান সাহিত্যে বাঙলা ভাষা ও বাঙালী প্রতিভাধর ব্যক্তিদের নাম যত্র-তত্র পাওয়া যায়। সব থেকে বেশী যাদের নাম ও রচনা উদ্ধৃত হয় তাঁরা হলেন—স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, শ্রী অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র। এ রচনায় সেই সব উদ্ধৃতি অল্পবিস্তর আলোচনার সঙ্গে নীচে স্থাপিত হ'ল।

হিন্দীতে যশপাল নামক একজন লেখক আছেন যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের মহিমা বিপ্লবের বীর সৈনিক ভগৎ সিংহ, চন্দ্রশেখর আজাদের সহকর্মী বিপ্লবী ছিলেন। সিংহাবলোকন নামে তাঁর দুই খণ্ডে লেখা বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি-কথাও আছে। এই বইতে তিনি গাড়ীর তলায় বোমা রেখে বড় লাটকে হত্যা করার প্রয়াসের কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন :—

“ঘটনার খবর অণু জায়গার থেকে কলকাতায় প্রথম পৌঁছয়, আমি গিয়ে সুশীলা ভীকে খবর দিতে উত্তেজনায় তাঁর চোখে চমক দেখা গেল। তখন কলকাতায় খুব দ্রুত কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের খবর পৌঁছেছিল। বড় লাটের গাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণের খবর পেয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ব্যক্তিরা উত্তেজনা ও আনন্দে উন্মত্তের মতো হয়ে পড়ে।

গান্ধীজী অধিবেশনের আরম্ভেই অধিবেশনে বোমা বিস্ফোরকের বিরুদ্ধে, বড় লাটের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের এবং তাঁর প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব নিজে উপস্থাপিত করলেন।……

পরের বছর কলকাতা অধিবেশনে প্রস্তাব রাখা হল যে যদি সরকার এক বছরের মধ্যে কংগ্রেসের দাবী পূর্ণ না করে তো কংগ্রেস ১৯২৯-এর অধিবেশন থেকে ব্যাপক সার্বজনিক আন্দোলন শুরু করবে।”

উপরে উদ্ধৃত অংশে কলকাতার উল্লেখ হয়েছে। যদিও তামিল ও বাঙলা ভাষা ভারতীয় হিন্দীর বিরোধ করে থাকেন তবু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে হিন্দীর প্রচার প্রসারে বাঙালীর অসীম দান আছে। নিম্নস্থ উদ্ধৃতিতে হিন্দীর অভূতপূর্ব সমর্থনের উল্লেখ পাওয়া যাবে। উদ্ধৃত অংশ মধ্যপ্রদেশস্থ রায়পুর সহর থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র (নব ভারত) থেকে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :—

.....“হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব রাখেন জ্ঞানী গুরুমুখ সিংহ মুসাফির। পরে ১৯৫৭-৫৮-তে এই ব্যাপারে হিন্দীর জিৎ হয় এক কম্যুনিষ্ট বাঙালীর (সাংসদ) সমর্থনে”— এখানে এক বাঙালীর প্রসঙ্গ পাওয়া গেছে।

শান্তিনিকেতনের হিন্দী ও সংস্কৃতের অধ্যাপক হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর এক গ্রন্থে তিনি দেবনাগরী লিপিতে রবীন্দ্রনাথের—“তুং ক্ষুদ্র অতি তারেও বন্ধে বাঁধিয়া মাতা বসুমতি.....” কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বিখ্যাত কথাসিল্পী বিমল মিত্রের “বেগম মেরী বিশ্বাস” উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদে বিমল বাবু সম্বন্ধে লেখা হয়েছে :—

“হিন্দী পাঠককে বিমল বাবুর পরিচয় দেবার আবশ্যকতা নেই। বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের পরই বিমল বাবু এমন কথাকার ভারতের কোণে কোণে যাঁর পাঠক আছে। খুব বেশী দাম হলেও বিভিন্ন ভাষায় তাঁর উপন্যাসের চাহিদা বাড়ছে দিনে দিনে। তাঁর সফলতা ও জনপ্রিয়তার সব থেকে বড় প্রমাণ এই।

এই চার গ্রন্থে (বেগম মেরী বিশ্বাস, সাহেব বিবি সোলাম আদি) বিমল বাবু দীর্ঘ ২০০ বছরের কথা পরিক্রমাকে বাস্তবিক রূপে নিক্রপিত করেছেন। বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র ইতিহাসের রূপে নিভেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।”

এই অনুবাদ গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উদ্ধৃতি পাওয়া যায়; যেমন—“জনসাধারণের চরিত্রগুণে রাজ্য স্থাপিত হয়। জনসাধারণের চরিত্রদোষে রাজ্য নষ্টও হয়।” এই অনুবাদ গ্রন্থেই ক্রাইভের মুর্শিদাবাদ আগমন উপলক্ষ্যে উল্লেখ আছে :—

“এত দিন যারা আরামসে দরওয়াজা বন্ধ করে, ঠোঁটে ভাল লাগিয়ে বসে ছিল তারাও গঙ্গার তীরে ঘাটে ঘাটে জমা হতে লাগল..... এখন গৃহস্থা নারী নির্ভয়ে গৃহকার্য্য করতে পারবে। জোর জবরদস্তী কেউ কলমা পড়াবে না। মুর্শিদাবাদের লোক ওদিকে ইংরাজদের (ইংরাজের জাহাজ) দেখে খুশীতে নেচে উঠল।

জাহাজ থেকে গোরা পল্টন অবতীর্ণ হতে লাগল এবং মুর্শিদাবাদের জগৎ মেয়েরা শংখ-ধ্বনি শুধু করল এবং মুখ দিয়ে হলুদধ্বনিও দিতে লাগল।”

এ উদ্ধৃতিতে ভখনকার বাঙালয় নবাবের লোকদের প্রতি মানুস কত বিরক্ত ছিল তা বোঝা যায় এবং তা থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে তারা অজান্তে আর এক বিরাট শত্রুর সমর্থনও করেছিল।

এ রচনায় জগদীশ বিদ্যার্থীর লেখা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর (হিন্দী) জীবনী থেকে দয়ানন্দচৌ সম্বন্ধে বাঙালী মহামানবদের বাণী উপস্থিত করে শেষ করা হবে।

“স্বামী দয়ানন্দ, যাঁরা আধুনিক ভারতের রূপকার তাঁদের অন্যতম ছিলেন”। তিনি ভারতের আচার সম্বন্ধীয় পুনরুত্থান ও ধার্মিক পুনরুত্থানের কারণ।” —সুভাষ চন্দ্র বসু

আমি আধুনিক ভারতের পথ প্রদর্শক স্বামী দয়ানন্দকে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি। তিনি অধঃপতিত দেশকে সরল সত্যের পথ দেখিয়েছিলেন। —রবীন্দ্রনাথ

দয়ানন্দ-র ব্যক্তিত্ব তাঁর কাজ আর কার্যা-প্রণালীর জন্য অদ্ভুত ছিল। দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালে বলতে হয় যেন কোনো ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরে পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে। পর্বতমালার মধ্যে কোনটি খুব উঁচু, কোনটি খুব নীচু কিন্তু অতি সুন্দর এবং নিজস্ব দৈর্ঘ্যের জন্য চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তারই মধ্যে একটি পর্বত একদম আলাদা দাঁড়িয়ে আছে এবং তার চূড়ায় আছে মনোরম শ্যামলতা। এক নিঃসঙ্গ দেবদারু বৃক্ষ আকাশের সঙ্গে কথা বলছে। সেই পর্বতের মধ্য থেকে স্বচ্ছ এবং উর্বরতাদায়ক ধারা প্রবল বেগে উপত্যকার দিকে বয়ে চলেছে যেন এই বেগ সেই উপত্যকার জীবনমূল। এই এক সংসার যা আমি তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে পেয়েছি।

সরোজিনী নাইডু (বানানটা “নায়ডু” হওয়া উচিত কারণ শব্দটা “নাইডু” নয়) মূলতঃ ছিলেন বাঙালী কন্যা সেজন্য তাঁকে বাঙালী ধরে এখানে তাঁর বাণী উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছেন—“লোকে তাঁকে চিন্তেই পারেনি। তাঁর কথা ভাবলে আমার, মহর্ষি দয়ানন্দকেই স্বাতন্ত্র্যতা ও কর্তব্যবোধের শিক্ষা-রূপী বাঁশী-বাদন রত কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে। তাঁর ভাষায় সৌন্দর্য্য ভ্যাগ ও বলিদানের শিক্ষা আছে। হে ঋষি তোমার প্রশংসা করার মতো ভাষা আমার নেই।”

কথায় গেলে গাবে কেহ

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

(শান্তনা সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চললো কদিন নোতুন বোকে নিয়ে বেড়ানো। আত্মীয়, স্বজন, সব জায়গা থেকেই নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, নানাভাবে আসতে লাগলো। আধুনিক কথায় যাকে বলে লাক, ডিনার, পার্টি ইত্যাদি। আনন্দ কোরতে কোরতে হররাণ বরকনে। ফাঁকে ফাঁকে চললো সিনেমা থিয়েটার নানা ফাংশনে যাওয়া।

রওনা দিলো সুকলাণ প্রশান্ত ঝিমলীকে নিয়ে তাদের দেশের বাড়ীতে। সেখানে এসেও মস্ত ব্যাপার। ফের মোটামুটি। বেশ বড় নিমন্ত্রণ হলো নিজের বাড়ীতে। মেয়ে জামাটকে দেখে খাওয়া দাওয়া করবে সবাই। এত সকলে ঝিমলী ঝিমিয়ে গেল যেন আনন্দের ওজনে। কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিয়ে ফিরে গেলো সব এলাহাবাদে। তারও দিন সাতেক বাদে বর কনে কাশ্মীর বেড়াতে গেল—কুলুমানীতে। ভূষর্গ কাশ্মীরের অতুলনীয় সৌন্দর্যের মাঝে, নূতন বরকনের দিনগুলি যেন আনন্দে ভেসে যেতে থাকে।

ওরই মধ্যে প্রশান্ত নূতন পাতা বা গাছ যত ক্ষুদ্রই হোক না—সে মন দিয়ে দেখতো—সংগ্রহ করতো। ঝিমলী আঁকতো। কাশ্মীর দৃশ্যেরও কিছু কিছু ঝিমলী স্কেচ করেছে।

দিন যায়।

প্রশান্ত এখন দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। থিসিস আগেই জমা দিয়েছে। তার স্থির বিশ্বাস, উদ্ভিদ থেকেই সর্ব্ববৃক্ষ রোগের ঔষধ পাওয়া যায়। এমন একটা কিছু খুঁজে বেড়ায়—বলে না সব কথা কাউকে বিশেষ—যেটা থেকে জোরালো ওষুধ বের করলে, তা থেকে তত্নিনটে কঠিন ব্যধির ওষুধ হতে পারে একই সঙ্গে।

দশ পনের দিন বাদেই ওরা ফিরলেন এলাহাবাদে। সঙ্গে কিছু কিছু গাছ গাছাড়া। এনেছে সযতনে, নানাভাবে। প্রশান্তর এসব কাজের জ্ঞান বড় একটা ঘর ও তৎসংলগ্ন ভালমত একটা ঘেরা বারান্দা ঠিক করা আছে। সেখানে কত যন্ত্রপাতি, শিশি বোতল, গ্রাসিড্, নানা সরঞ্জাম গোছানো। সুরক্ষিত থাকে সেটা। একটা পাঠ্যপুস্তকও লিখেছে এক প্রফেসরের সঙ্গে। বইখানি খুবই সমাদর লাভ করেছে। প্রফেসরের সঙ্গে তার নামও যুক্তভাবে লেখা রয়েছে। প্রশান্তকে সবাই তার বাবার লাইন ধরে পড়াশুনা কোরতে বললেও, বাবা প্রকাশ মুখুজে, কোনদিন প্রশান্তকে এ ব্যাপার নিয়ে কোন অনুরোধ করেন নি। ছোট থেকেই মাষ্টার মশায় ও পরে প্রফেসরদের কাছে জিজ্ঞাসা কোরে কোরে জেনে নিতো। সে লক্ষ্য করেছে তুঙ্গসী পাতা,

বেলপাতা, সব টুকটাক—সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে ওয়ুধের ব্যাপারে। পরীক্ষা কোরতো। প্রশান্তর বাবা ছেলেকে খুবই উৎসাহ দিতেন ছোট থেকেই। ছেলের উপর আশাও রাখতেন বড় হবার। এখনও মাস দেড়েক ছুটি আছে।

মনের আনন্দে গবেষণায় লেগে গেল সে। প্রশান্তর ঠাকুরমা, মা ও বাবা ঝিনসীকেও ছেড়ে দিতেন প্রশান্তকে সাহায্য করবার জন্য। সেও গবেষণাগারের ছাত্রী হয়ে গেলো।

উৎসব আপাততঃ শেষ হলো। একে একে ফিরলেন সবাই স্বস্থানে। ফিরলেন সুকল্যাণের বাবা। ঝিনসীর বন্ধু এষা ও তার বাবা। মাস ছয়েক বাদেই চৌধুরী রিটার্নার কোরে কোলকাতায় এসে থাকবেন।

ফিরে যাবেন সুকল্যাণের মাষ্টার মশাই। কিছুদিন থাকবেন ইণ্ডিয়ায়। ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন সুকল্যাণের সঙ্গে। পাশাপাশি লগুনে ছিলেন এরা অনেকদিন। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। মাষ্টার মশায়ের ভাইপো, ভাইঝি সুকল্যাণের সঙ্গে পড়ে। ভাইপো ফিরেছেন দেশে, ভাইঝিও ফিরবেন দেশে। তাকে এখনও থাকতে হবে লগুনে—ইচ্ছে আরও কিছু জ্ঞান আহরণ করা। শেলী নাম রেখেছেন ইণ্ডিয়ান অস্টি (কাকীমা) অর্থাৎ মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী।

সুকল্যাণ কৃতিত্বের সঙ্গেই ডাক্তারী পাশ করেছে। এফ. আর সি. এস হয়েছে। আরও একটা বড় পরীক্ষা দিয়ে এসেছে।

দিল্লীতে এসেছে সুকল্যাণ। কয়েকটা হাসপাতালের সঙ্গে আগেই কথাবার্তা বলা ছিলো। সেসব জায়গায় যায়। নিজেও প্র্যাক্টিস কোরবে। সেই বন্দোবস্ত তার মাষ্টারমশায় ও সত্যাবাবুর সঙ্গে ঘুরে ফিরে ঠিকঠাক করতে লাগলো। এই সময় সত্যাবাবু পরামর্শ দিলেন, এখন দিল্লীতে থেকে চাকরী কর। আমাদের বর্ধমান শহরে খুব ভাল একটি নার্সিংহোম করবো। তোমার বাবাও বাংলা দেশে আসছেন। কোলকাতা, কাছে পাবে। খুব ভাল নার্সিংহোম করলে বর্ধমান ও আশে পাশের বাসিন্দাদের পক্ষে খুব ভাল হবে। কোলকাতায় যাতায়াত করে বড় বড় ডাক্তারী ব্যাপারে যুক্ত থাকতে পারবে। আমরাও বুড়া হয়ে, তোমাদের কাছে, কাছে থাকতে পারবো।

সুকল্যাণের মনে হলো, এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কী হতে পারে? সে সানন্দে ওর বাবার কোলকাতা আসবার পর পুরোপুরি ব্যবস্থা কোরবে। ইতিমধ্যে পরীক্ষার ফলও বেরিয়ে যাবে।

সত্যাবাবু বইপত্র লিখে প্রচুর আয় কোরেছেন। চৌধুরী—সুকল্যাণের বাবাও অর্থবান। দুজনেই অকাতরে নার্সিংহোমে অর্থ সাহায্য করবেন। সুকল্যাণের দাদামশায়ও অর্থবান ছিলেন। মামারাও কৃতি। দিদিমার ছুটি মেয়ে। সুকল্যাণের মা অরুণা ছিলেন ছোট মেয়ে। সে গত হওয়ার নাতি সুকল্যাণের উপরও বেশী আকর্ষণ দিদিমার। তিনিও ওর এই ব্যাপারে অগ্রসর হতে চাইলেন। এ সমস্ত, আলোচনা আগে যে না হয়েছে তা নয়। সত্যাবাবু বর্ধমানে সুন্দর ফাঁকা জায়গার ব্যবস্থা কোরেছেন। ওর জানাশোনা বন্ধুলোকের ডমি।

বেটে গেছে ছুটি বছর, নানা ছোট বড় ঘটনার মধ্য দিয়ে। সুনয়না ও সত্যব্রত, সবাই তাদের দেশের বাড়ীতে এসে রয়েছেন। সহর থেকে ছুতিন ঘণ্টার রাস্তা মাত্র। সুকল্যাণের বাবা বন্ধিমানের বাসা কোরেছেন। সরকারী বেসরকারী সমস্ত বন্দোবস্ত কোরে নার্সিংহোমের বিল্ডিং উঠেছে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে কাজ হয়েছে। জল ও আলোর বন্দোবস্ত হচ্ছে। বড় বড় ইন্দারাও কাটা হয়েছে। জমি সংলগ্ন পুকুর ও বাগানও আছে। সেই পুকুর কেটে পাক্কার কোরে বড় করা হয়েছে। এখন আপাততঃ ছোট নার্সিং হোম হলো, পরে বড় হবার আশা রাখেন। কিছু দূরে জনসাধারণের চিকিৎসার্থে চেম্বারও হয়েছে। আলাদা ভাবে চোখ দাঁত সব রকমের চিকিৎসার বন্দোবস্ত গড়ে তোলা সহজ নয়। প্রাণপণ চেষ্টায় সব কিছু সুন্দর বন্দোবস্ত হচ্ছে। ক্রমে উন্নতিরও আশা করা যায়।

উদ্বোধনের জন্য বেশ আয়োজন হলো মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন-এর ডিরেক্টর এলেন, আর এলেন কোলকাতা থেকে নামকরা সব ধর্ম্মগুরি পুত্র, বড় বড় ডাক্তাররা।

সুকল্যাণের দিদিমা বুড়ী খুবই অসুস্থ। আশী বছর বয়স হয়ে গিয়েছে তার। তাকেও সমাদরে আনা হয়েছে উৎসবে যোগ দিতে। সভার পর নাতি সুকল্যাণ তাকে ছোর কোরেই একটা বেডে শুইয়ে দিলে। ফিতে কেটে 1st পেশেন্ট দিদিমাকে সম্বর্ধনা জানানো হলো। দিদিমা কৃত্রিম রাগ কোরে আর স্বর্গী ভা কথ্য অকণার কথা মনে পড়ায়, অশ্রুসিক্ত নয়নে মৃহ মৃহ হাসতে লাগলেন।

ডাঃ চৌধুরী, সত্যব্রত বাবু, সুনয়না দেবী, ঝিমলী সকলেরই আনন্দের মাঝে মন ভারাক্রান্ত আছিল। ঝিমলীর কোলে এসেছে একটি সুন্দর তুলতুলে মেয়ে। কটাদিন আগেই নামকরণ উৎসব অর্থাৎ অনুপ্রাশন হয়েছে। নাম “তুলতুল”

যা হোক নার্সিংহোম খোলা হলো। নাম “অরুণা নার্সিংহোম” বেড্ চল্লিগটি। কুড়িটি মেটারনিটি বেড্। কুড়িটি অন্যান্য রোগীদের জন্য জেনারেল বেড্। সাত, আটটি পেশেন্ট আজই ভর্তি হয়েছে। বাড়ীতে একটা চেম্বারও খুলেছে সুকল্যাণ। সকাল সন্ধ্যা রোগী দেখবে বোলে।

গড়িয়ে চলে দিন, মাস ও বছর। আন্তরিক চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে “অরুণা নার্সিং হোম” বেশ জাঁকিয়ে বসল। ক্ষুদ্র হলো বৃহৎ। ক্রমে বৃহত্তর।

—○—

ঝিমলী থাকে দিল্লীতে। প্রশান্ত ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। ডক্টরেটও হয়েছে কয়েক বছর হল (বায়োকেমিস্ট্রীতে)। উদ্ভিদ থেকে ওষুধ বের করতে চায়; কুষ্ঠ ব্যাধির এ বিষয়ে আরও বৃহত্তর গবেষণার জন্য উত্তরে, গাছের ছাল ও উদ্ভিদ পরীক্ষা করতে চায়। সঙ্গে যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ছোট্ট একটু ল্যাবরেটরী। আপাততঃ মাসছয়েক ছুটি নিয়েছে। কর্তৃপক্ষের কাছে

অকপটে সব জানিয়েছে। ইতিমধ্যে আর একখানি বই লিখেছে—যেটা নাকি বহু প্রশংসিত হয়ে কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয়েছে।

ঝিমলীকে ও বছর দেড়েকের মধ্যে তুলতুলিকে এলাহাবাদে নিয়ে এলো। ঝিমলী স্বস্তির শ্বাস্তরী কাছেই থাকবে এখন। প্রশান্তুর ঠাকুমা এখানেই আছেন। চপতে, ফিরতে প্রায় পারেনই না। তাকে প্রশান্তুর সব কথা জানানো হলো না। ক্রমাগতঃ ব্রহ্মাইটিজে ভুগে ভুগে হৃদয়লতার চরমে এসে পৌঁছেছেন।

ওদিকে সুকল্যাণের বাবা বর্ধমানের এসে নাসিংহোম খুব ভালমত চালাতে লাগলেন। তাই সুকল্যাণ মাস খানেকের জন্য ওখানকার সব ভার তার বাবা ও অণ্ড ডাক্তারদের উপর দায়িত্ব দিয়ে, প্রশান্তুর প্রাথমিক গবেষণার কাজে সাহায্য করবার জন্ত এগিয়ে এলো।

শুভদিনে শুভক্ষণে এরা ঋষিকেশ রওনা দিলে। জনা আষ্টেক কুলি জিনিষপত্র নিয়ে ঋষিকেশ ছাড়িয়ে পথ দেখিয়ে এদের নিয়ে চললো। আসলে এরা পাহাড়ের পথঘাট সম্বন্ধে ভালমত ওয়াকিবহাল। নানা পাতালতার ওষুধপত্রও জানে কিছু কিছু। একজন বিচক্ষণ আয়ুর্বেদক অর্থাৎ কবিরাজ স্ব-ইচ্ছায় এদের সঙ্গে নিলেন। হরিদ্বারে আলাপ হয়েছিলো। প্রশান্তু খুবই খুশী হয়ে, কবিরাজ শর্মাকে সঙ্গে নিলেন। প্রশান্তুর মা, বাবা এক্সপার্ট একজন কন্বাইণ্ড হ্যাণ্ড দিলেন সঙ্গে কুলীদের খাওয়া দাওয়ার অন্য বন্দোবস্ত।

ঋষিকেশ থেকে মাইল পাঁচেক ভিতর দিকে গিয়ে প্রথম তাঁবু ফেললো সবাই। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সব কাজ চলতে থাকে। চলে গাছ, গাছড়ার জোগাড় যন্ত্র কোরে পরীক্ষা নিরীক্ষা। কবিরাজ শর্মাও তার মতামত জানান। প্রশান্তু শর্মার প্রতিটি মতামতই নোট কোরে রাখে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে সে শ্রদ্ধা করে। ভোরে চা খেয়ে, ফ্লাক্সে চা নিয়ে, অন্যান্য জলখাবার সহ রওনা দেয় প্রশান্তু ও সুকল্যাণ। সাথে দুটি একটি কুলিও যায়। পথঘাট চেনে তারা স্থানীয় অভিজ্ঞ লোকও সঙ্গে নেয়। পাহাড়ী পথঘাট চিন্তে কষ্ট হয় না। হুপুর নাগাদ সবাই ফিরে আসে।

কয়েকটা দিন বাদে তাঁবু গুটিয়ে ফের বাঁয়ে ঘেসে মাইল কয়েক এগিয়ে তাঁবু ফেললে। উদ্দেশ্য বাঁয়ে ঘেসে বহুদূর গিয়ে ডান দিক হয়ে ঘুরে ফিরে দক্ষিণে নেমে এসে ফিরবে—যেখান থেকে রওনা হয়েছে সেদিকে। যাক, সেটা পরের কথা। আপাততঃ, শুধু চরৈবেতি, চরৈবেতি। সংগ্রহ পরীক্ষা ও গবেষণা, সবই চলতে থাকে, পুরোদমে। কিছুদিন বাদে সুকল্যাণ ফিরে এলো নাসিংহোমে।

ক্রমশঃ

ইক্ষু জমুদ্র

(ধারাবাহিক উপন্যাস)
(জ্যাতিয় বাল্যাপাধ্যায়)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সহকর্মীরা কেউ কেউ বলে, শুভ, তোর কুঅভ্যাসে দাঁড়িয়েছে রোগটা। সমতল থেকে চাকরী করতে এসে পেটের জন্যে আরেক চাকরীতে পড়েছে বাঁধা। গিরীন্দ্রকুমারী জঙ্গার মতই আরেক ফুলকুমারীর মায়ামোহে। ফুলমায়াও কি গিরিনন্দিনীদের মতন পঞ্চ ভগিনী? কে জানে। আপাতত দেখছি বাড়িতে সে একা। শুনছি বাপমা গেছে নেপালের ধুলাগড়ীতে না কোথায় আত্মীয়বাড়ী বেড়াতে। এখানকার মিশনারী কলেজে অধ্যাপনা করতে এসে এদের পাশেই একখানি বেডরুম ভাড়া নিয়ে থাকছি; খুচরো আনুসঙ্গিক প্রকৃতিক ঝামেলা সারতে হয় ওদেরই স্নানঘরে। ভাড়া মাসিক তিনশো টাকা। কমও নয় নিতান্ত। অবস্থা এখানকার এইরকমই। ভিকটোরীয়া ফলসের ধারেই প্রায় বাড়িটা। তিনতলা। তার মধ্যে একতলাটার পেছদিকটা ঢাকা পাহাড়ে, উন্মুক্ত কেবল দোতলা তিনতলার ঘরকখানি। একতলায় তিনটে ঘরে তিনটে দোকান, কাপড় কাচা ধোবার মনোহারী ও মৃদীমশলার বিহারী লোকটার এবং লেপ্‌চা স্বজুর দাওয়াইকো দোকান। সিঁড়িটা পাশেই খোলা ছাদ, দোতলায় একটায় আমি অপর দু'টিতে ফুর্বালমা সপরিবারে তাই দোতলার বাথরুম দখলে তার। আমাকে উঠে যেতে হয় তিনতলায় প্রথম ঘরদুটো পেরিয়ে বাড়িওয়ার বাথরুমে। প্রথম ঘরটা দোতলায় আমার ঘরটার মাথার ওপর, বসবার দু'টো গদীমোড়া কাঠের হাতলযুক্ত চেয়ার সিমেন্টের দেয়ালে কাঠের তাকে ভানুভক্তের কিছু বই—কবিগুরু কবিসম্রাট ভানুভক্ত ওদের—একেবারে উপরে তাঁর প্রতিকৃতি একখানা, ঠিক নীচে একটা মীসার শোকেসে কিছু বাসনকোসন রেকাবী ফুলদানী স্টীলের ও চিনেমাটির। ওপরে তারই কাঁচের ফুলদানীতে ফুলসেজ রচনা হয় প্রত্যহ। দু'পাশে দু'টো চৌকিতে তোষকের পরে শুদৃশ্য ফরসা চাদর বিছানো, পাশের একপাল্লা দোর দিয়ে প্রবেশ দ্বিতীয় ঘরটিতে যেখানে বাস করে ফুলমায়া আর তার মা পুষ্পকুমারী, সেকারণে একই ভঙ্গিতে আরো দু'টি চৌকিতে বিছানো শয্যা। কিন্তু অনেক ফটো এঘরে আর বাক্সপেটরা থাক থাক বসান দেয়াল ধরে কাঠের আলমারী দু'টো সব বোধহয় নানান রকমের সুতী ও পশমী পোষাকে ঠাসা; অনেক পুরুষ নারীর ছবির মধ্যে একখানি তুর্গামায়ীর বড় ফটোতে রোজ মালা দেওয়া হয়ত জলমিষ্টিও; তৃতীয় ঘরে প্রবেশের মুখেই লম্বা একফালি বাথরুম—যার মধ্যে সমস্ত সাক্ষুফ সবকিছুই বর্তমান। বলেছিল বটে একবার ওই ওপাশের তৃতীয়

ঘরখানিতে অন্যদের থাকা। কিন্তু সেই অনারা যে কে তা জিজ্ঞেস করা হয়নি কখনো। হয়ত আরো ভাইবোন আছে ফুলমায়ার অথবা আরো কেউ। কৌতুহল হয়নি জানার।

এবাড়িতে এসে ওঠার আরেকটা ইতিহাস আছে।

এম. এ পাশ কোরে অধ্যাপনার কাজ খুঁজছি; কমিশনের অফিসে হানা দিয়েছি বারকয়েক। মালদহ থেকে কলকাতায় ঘন ঘন যাওয়াও শুরুঠিন মনে হয়। তবুও পূর্বতন রেলমন্ত্রী খানসাহেবের কৃপায় আমরা মালদহবাসীরা গোড় এক্সপ্রেসটা পেয়েছি। একটা পত্র পেলাম ডাকে দার্জিলিংয়ের সেন্ট জোসেপ কলেজ থেকে—মিশনারী কলেজ—সাময়িকভাবে ছয়মাসের জন্যে চাকরী করতে ইচ্ছুক থাকলে সেখানে যেতে পারি, জনৈক অধ্যাপক ব্যক্তি ছুটিতে গেছেন দিল্লীতে কি পড়তে—ই।। দিল্লীতে লগুনে এমেরিকায় নয়। মক্কা জেলা শহরে বেকার চূপচাপ বসে থাকার বিড়ম্বনা যথেষ্ট। এলুম চলে, উঠলুম এই ফুলমায়াদের ঘরেই যেখানে আগের ভদ্রলোক থাকতেন সস্ত্রীক নিঃসন্তান, পাশের ভাড়াটে ফুবা লামার ছিলনা পৃথক কিচেন সেটা অধ্যাপক ব্যবহার করতেন। সব ছেড়েছুড়ে চলে যাবার পরে আমি এলুম নিঃসঙ্গ, তখন রান্নাঘরটা যুক্ত হল লামার ঘরহঁটোর সঙ্গে। একা আমি তাই পেট আমার কিচেন ঘর চায় না।

ঠিক ছয়মাসই থেকে ছিলুম সেবার।

ফুলমায়াকে দেখতুম, ফুলমায়ার বাবাকে মাকে, কিন্তু আর কেউকে দেখেছি কিনা ঠিক মনে নেই। অবশ্য অতটা আগ্রহ ছিলনা দেখার। খানিকটা ভ্রমণ উদ্দেশ্যে এসেছিলুম নিতান্ত অমনোযোগ নিয়েই, জানা ছিল চাকরীটা ঠিক ছয়মাস পরে খতম হবেই। ভদ্রলোক উচ্চতর পড়াশুনা কিংবা গবেষণা করতে গিয়ে তোঁ চিরকাল ধরে বেকার থাকবেন না। অবশ্যই ফিরে আসবেন যদিনা অন্য কোথাও ভাল চাকরী পান। সেই সঙ্গে একটু বা ক্ষীণ আশা যদি না ফেরেন তোঁ আমার চাকরীটা পাকা হয়।

মনে পড়ে একদিনই ভাল করে কথা বলেছিল ফুলমায়া সেবার। এক বিকেলে চূপ চাপ দাঁড়িয়ে ছিলুম রাস্তাটার ধারে যেখানে পাহাড়ের ঢালটা নেমেছে খানিক আরেকটা নীচের দিকের পথে দুই দিকে যার আরো ঘরবাড়ি। তারপর অনেকটা নেমে ওপর জজবার কালো অন্ধকারের মতন তিন দিকের পাহাড়ের সঙ্গম স্থলের অন্ধকারটা চোখে পড়ে ওপর থেকে সেই নীচে কখনো যাইনি। বাঁদিকের পাহাড়টা যেটা ঘুরে ফিরে চলে গেছে সুখিয়াপোখরী-বিজনবাড়ির দিকে তার মাথার দিকে কি আছে দেখিনি তবে তলার দিকে চিরস্তন অজানা জায়গা অন্তত আমার কাছে; আর ডান দিকেরটার প্রচুর বসতি। শহরের মধ্যভাগে বাজার এলাকার নিম্নাংশে চাঁদনী পল্লী ছড়িয়ে আরো কত যে বড় ছোট বস্তী ঘিঞ্জীর বসতি; সেদিক দিয়েই গোল পাহাড়ের গাটা এগিয়েছে অর্ধ চক্রাকারে নর্থ পয়েন্টের দিকে। মাঝপথে সরকারী কলেজ ও কবরখানা পেরিয়ে নীচের ঢালেই বিখ্যাত হ্যাপি ভ্যালির চা বাগান—বাক্সালীর—সেই চা বাগানের আনাচে কানাচে আগে পরে অনেক বাটো (পথ)

চোরবাটো (সোজা বা গুপ্তপথ) আছে ; সেই বাটোগুলি দিয়ে নেমে চলে যাওয়া যায় বাদামতাম চা বাগানে বাগানের কোয়ার্টার বস্তীগুলি ছাড়িয়ে আরো নীচে যেখানে প্রায় পাঁচহাজার ফুটের উচ্চতার সাত আট হাজার ফুট উচ্চতা থেকে নেমে আসা পাহাড় ক'টার মিলন সমতলে পল্লীগ্রাম ওরা যাকে বলে বস্তী—সেখানে আলুর চাষও হয় সেখান থেকে সোজা হেঁটে গেলে পাওয়া যায় ফুল বাজারের রাস্তাটা সেই রাস্তাটা ধরে এগোন যায় বিজনবাড়ির দিকে । বিজনবাড়িতে বিছাতের পাওয়ার হাউসটাতে বিছাৎ উৎপাদন হয় ।

দেখছিলুম এসব ভাবছিলুম দাঁড়িয়ে এমন সময় খিনখিনে গলার কাঠ কাঠ আওয়াজে কে বলল, ঘি গরদাইছন্ এস্তো দ্বাজ ? (এখানে কি করছেন দাদা ?)

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি ফুলমায়া হাসছে দাঁড়িয়ে পেছনে । সন্কেচ একটু কেন বেশ হচ্ছিল । বিদেশে বিভূয়ে অচেনা নারীকে কথা বলতে দেখলে—অবশ্য অপরিচিতা নয় । বাড়িওয়ার মেয়ে । কিন্তু ওদের ভাষাতো জানিনে ! এই তিনমাসে কানে যদি বা রপ্ত হয়েছে খানিকটা ।

—আমাকে বলছেন ? ঢোক গিলে বললুম প্রশ্নটা ।

আবার প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ঢলে ঢলে পড়ল মেয়েটা । কান দু'টো লাল হল আমার গরমও, চোখ ছল ছল করছে । পাড়া কাঁপিয়ে বললে আবার, তমাকে না—সরী —অপ্নাকে না ত বলব কাকে ? ইখানে আউর কোন মান্‌ঘী ? ছাই না মেহি ।

সত্যি তো, বোকার মতন বলেছি কথাটা । আমি বাতীত অন্য তৃতীয় ব্যক্তি এখানে আছে কে যে কথা বলবে মেয়েটা ! হাসতেই হল অগত্যা, বললুম, কিছুনা, এমনি' দেখছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি ?

—ম বাজার থাকি আউছ । (আমি বাজার থেকে আসছি) হামরো ঘরমা কভি কভি আউনুস না ? মেরো বাবালে খুশি হুন্‌ছ ।

—যাবো, কখনো একসময় যাবো ।

—আজু আউনুস, আইলে, আজু আইতাবার । (আজ আসুন, এখন, আজ ছুটির দিন ।) এক ছিন্‌ হামরো ঘরমা বসের কুরা গরনুস্ । ম যান্‌ছু । (একটুকুণ আমাদের ঘরে বসে গল্প করুন । আমি যাচ্ছি ।)

ঠিক বুঝলুম না আমন্ত্রণটা কোন বিশেষ কারণে না গতানুগতিক সাধারণ ভিত্তিতে । কোন প্রশ্ন করার আগেই ভেগেছে মেয়েটা । ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠছে । হাতে ইসারা করল সিঁড়ি থেকে । বেশ যুক্তদিল্‌ স্বাধীনচেতা এই মেয়েরা দেখছি ! কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে না হোক প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচতে ঘরে ফিরতে হল আমাকে । ছিটে বৃষ্টি এসে গেল । বর্ষায় এমন হয় । ঢল নামল তো তিনচারদিনের জন্যে ; গুঁড়ি গুঁড়ি ঝরছে তো ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে । এক প্রস্থ কালমেঘ কেটে গেল তো আরেকটা । এমনি ধারা ।

ঘরে ঢুকবো বলে দরজার তলায় চাবি লাগাচ্ছি পাছটো স্বেচ্ছায় সিঁড়ির দিকে এগোল।
সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায়।

—আউনুস্ আউনুস্। প্রায় বৃদ্ধ কৃষ্ণবাহাদুর রাই দেবনাগরী হরফে ছাপা বই পড়ছেন।
চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুনুস্। দেখলুম নেপালী ভাষায় বই।

বসলুম, ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখে মাথায় পাগড়ী পরে যে ছবিটা ঝোলান সেটা
দেখলুম ভাল করে চেয়ে। ফুলের মালা রয়েছে ফটোতে।

—হামরো ভাষাকো সবসে চুলা কবি সত্ৰাট ভানুভক্ত। এতি রামরো রামরো কবিতা
সন্দেশ লিখেকোছ কবি সত্ৰাট লে—গলাটা সরু করে সোমে তুলে—কোইলে সাগ্দাই না লিখু।
হাতের বইটি বেশ মোটা দেখিছে—ই রামায়ণ রচনাকার ভানুভক্ত কবিসত্ৰাট। তুলসীদাসকো
হিন্দী রামায়ণ ছোড়ের এস্তো নেপালী ভাষাকো ভানুভক্ত রামায়ণ বিনা আউর কোই রামরো
পুরানা রামায়ণ ছুই না। হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক হাঃ হাঃ করে।

—মলের কাছাকাছি ন্যাচারেল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের ওপরে রবীন্দ্রভবনে কবি ভানুভক্তের
মূর্তি দেখেছি।

—হা। ভানুভক্ত হল্‌কো বাইর বারান্দামা। ভানুভক্ত নেপালী মান্বীজনাকো জাতীয় কবি।
নিকুন্তর বসে আছি চুপচাপ। ফুলমায়া চায়ের প্রকাণ্ড কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল, অনাহাতে একটা প্লেটে
ভাজি। মনে হল বেসমের বড়া ভাজা। ছোট্ট একটা তিরপাইতে রেখে বললে, মানুষ না।
হাতজোড় করল। এদের এই সামাজিকতাটুকু আমার ভাল লাগল খুব। কলেজে বাইরে কোন
লোকজনের বাড়িতে খাবার বা পানীয় দিয়েই করজোড়ে নিবেদন করে অতিথিকে।

—এক প্লেট বড়া খেতে পারব না আমি। কমিয়ে দিন।

—পারবেন, খুব পারবেন, খান। ফুলমায়ার মুখে বাংলা কথা শুনে বিস্মিত হলুম। বাংলা
জানেন আপনি?

—আলিকিত্তি। খোড়া খোড়া। হাসছিল ফুলমায়া মুখ ফুটে শব্দ করে।

—কোথায় শিখলেন? খেতে খেতে বলি প্রশ্নটা। মানে বেঙ্গলে ছিলেন কখনো?

—হজুর? এটাও ওদের ভদ্রতা। আমাদের মত ‘কি বললেন’ বা ‘এ্যা’ না বলে সব সময়
সম্মান দেয় অভ্যাগতের কথা না বুঝলে হজুর বলে। কিংবা কেউ ডাকলে সাড়া দেয় হজুর বলে।

কিন্তু নিজের প্রশ্নটার নিজেই বোকামী করলুম। দার্জিলিং তো বাংলারই এক জেলা।
তাড়াতাড়ি সংশোধনের চেষ্টা করি, মানে নীচের দিকে প্লেন এরিয়ায় কখনো ছিলেন নাকি?

কৃষ্ণ বাহাদুর রাই উত্তরটা করলেন, মায়া তো শিলিগুড়িতেই থেকে ছিল দুবছর যখন নর্থ
বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে এম. এ পড়তে গেছল।

ক্রমশঃ

পরিচয়

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

সুতীল কুমার ঘন্ডল (বীরভূম)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

“হ্যাঁ, কিছু সম্ভব হয়নি, হবেই বা কি করে, যতসব !” ঘণার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে গেল অপরেশের। সঞ্জীব কথার জের টেনে বললো, “সম্ভব হয়নি কেন ?” “কথার আছে না, একটা পণ্ডিত নিয়ে স্বর্গে যান, তবে এককোটি মুখ নিয়ে নয়—একদম সত্যকথা।” “পরিকল্পনার শুরু কেউ বুঝলো না তো ?” “বুঝবে কি করে ? অশিক্ষার অশেষ দোষ, আসলে শিক্ষা না থাকলে যা হয়—ভিতরে বোধ শক্তি বলে তো কিছু নাট।” “তারজন্য অশিক্ষাইতো শুধু দামী নয় ?” “দামী নয় মানে ? যতই বুঝিয়েছি, ততই দেখেছি না বোঝার ভান করে।” এবার মুহু হেসে সঞ্জীব বললো, “ভেগে ঘুমিয়েছিল।” “অনেকটা তাই, দেখি এবার কি হয় ?” “চেষ্টা করে যান।” “দেখা যাক, এদিকে স্বত্তরালয়ের ডাক এসেছে, না গেলে আবার”—“অসময়ে ডাক ?” “শ্যালিকার বিয়ে সম্পর্কিত।” “ক’জন শ্যালিকা ?” “জন দু’য়েক।” “ক’জনের বিয়ে হয়েছে ?” “একটারও না, আমার খ্রীষ্ট প্রথম।” “তাগলে তো ভাগ্যবান।” বলেই, মুহু হাসলো সঞ্জীব। মুহু হেসে অপরেশও বললো, “ভাগ্যবান নিশ্চয়—শুভুর—মহাশয়ের সব ক’টিই কথা রত্ন অর্থাৎ পরপর পাওনা।” কথাটা শুনে জোরে হাসতে লাগলো সঞ্জীব। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, “আপনার বিবাহিত জীবন কতদিনের ?” কথাটা কানে যেতেই হঠাৎ যেন একটা বেদনাঘন চিন্তার ছায়া এসে পড়লো অপরেশের মনের আকাশটায়। ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস অজান্তে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ যে আনন্দের জোয়ার তার মনের দরজার তুফান তুলেছিল, তা যেন অকস্মাৎ ভাটার টানে কোথায় হারিয়ে গেল। ভগ্নমনোরথে অসহায় রথীর মতো অপরেশ বললো, “বছর তিনেক।” “তিন বছর ! বাচ্চা কাঁচা তো কিছু দেখছি না ?” “তাছাড়া আপনি তো দেখছি একটু বেশী বয়সেই বিয়ে করেছেন ?” “অনেকটা তাই।” “তাই কেন, বৌঠানের বয়সের সঙ্গে আপনার বয়সের চেয়ে পার্থক্য তো”—“তা ঠিক।” “কতটা ছোট বড় হবেন ?” “দশ পনের বছর হতে পারে।” “বলেন কি ! এটা কিন্তু উচিত হয় নাই ? এতটা মার্জিনে বিয়ে ফিজিকেলী মাইণ্ডের দিক থেকে”—এবার মুহু হেসে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে বললো, “দোষটা শুধু আমার নয়, শুভুর মশায়েরও তাছাড়া”—“যাই হোক, বিয়ে করবেন যদি—এত লেটে বিয়ে করলেন কেন ?” “লেটে।” বলে, কি যেন চিন্তা করলো অপরেশ, পুনরায় মনের আকাশটায় কালবৈশাখীর বাতাসের ছেঁড়াকাটা মেঘের উদয় হল, গভীর বেদনা তার দু’চোখ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই

কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে অপরের বললো, “সেটে নয়, বিষে ঠিক সময়েই করেছিলাম, ভাগ্যে সহ্য হয়নি!” বলেই, নিজের অজান্তে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার অন্তর ভেদ করে। সঞ্জীব তাড়াতাড়ি সহানুভূতির স্বরে বললো, “হুঁশিত, না ভেনে হয়তো আপনার স্মৃতির নরম জায়গায় আঘাত করলাম।” এরপর একটু থেমে আবার বললো, “উনি কিভাবে মারা গেলেন?”

কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠলো অপরের, তারপর স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললো, “না, মারা যায়নি, মেরে গিয়েছে।” “সে কি! তাহলে কি উনি”—“ত্যাগ করে চলে গিয়েছে।” “ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন!” “ই্যা” আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলো, “মায়ের সঙ্গে ভেমন বনিবনা না হওয়ায় একদিন বিষ পানে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, তারপর”—“তারপর?” “এখান থেকে বাপের বাড়ী, আর আসে না।” ট্রাজেডি, যাই হোক, আনতে যাননি?” “না।” “উনি আসতে চেয়েছিলেন?” “না।” কিছুক্ষণের পূর্ণ নীরবতা। হয়তো হুঁজন হুঁজনের মধ্যে ডুবে গিয়েছে। অপরের জীবনে অতীতের কাটা ছেড়া স্মৃতি তাকে আজ এই মুহূর্তে বহুদিনের ফেলে আসা দিনগুলোর মাঝে টেনে নিয়ে বিচারের জেরা শুরু করেছে। সঞ্জীব একটি সুখী দাম্পত্যজীবনের এক ভবিষ্যৎ খসড়া রচনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু তা যে সুদূরপরাহত তাও সে বোঝে। কিছুক্ষণ পর সঞ্জীব নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করলো, “ডিভোর্সও তো হয় নাই? সঞ্জীবের আকস্মিক এ প্রশ্নে আবার সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, “না।” “এ বিষের খবর অর্থাৎ দ্বিতীয় বিষের খবর তিনি জানতেন?” “জানতো বলে শুনেছি।” “এ বিষেতে আপত্তি জানান নি?” “না।” “মতামত কিছু একটা”—“জিজ্ঞাসা করা হয়নি, তাছাড়া এ বিষে মা একরকম জোর ক’রেই দিয়েছেন।” “অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যাই হোক, ওণার সঙ্গে আর দেখাও করতে যাননি?” “না।” “রহস্যটা বেশ জটিল। অথচ অত্যন্ত বেদনাদায়ক!” একধার কোন উত্তরই দিল না অপরের। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সঞ্জীব হঠাৎ বললো, “চলুন, হুঁজনে একদিন ঘুরে আসি।” অনেকটা দুঃমনস্কের মতো অপরের বললো, “কোথায়?” “আপনার পুরোনো স্বগুরবাড়ী।” কথাটা শুনে বেদনাক্লান্ত স্থিরদৃষ্টিতে অপরের তাকালো সঞ্জীবের মুখের দিকে। হয়তো সঞ্জীবের অন্তরের কথাটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলো, হয়তো বা হারিয়ে যাওয়া সম্পদের মধ্যে স্মৃতির কুহেলিকাময় স্বপ্নাচ্ছন্ন আকর্ষণে। তখনই কোন কথা বলতে পারলো না সে। পুঞ্জীভূত জীবন যন্ত্রণার স্তরীকৃত বিষাক্ত ধোঁয়ায় সব কিছুই যেন খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললো, “তা আর সম্ভব নয় সঞ্জীববাবু, যা হবার হয়ে গিয়েছে!” “তবুও তো শেষ দেখা হ’ল না?” আবার কিছুক্ষণ থেমে অপরের বললো, “শেষ!” ই্যা, শেষ দেখাও হয়ে গিয়েছে!” কথাটা শুনে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল সঞ্জীব অপরের মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে অপরের নিজেকে অনেকটা অসহায় বোধ করলো। অপরের এতদিনকার জীবনের চলার সহজ পথটা আজ বোধহয় ভেঙে হুন্ডে গিয়ে সব কিছু অচল করে

দিতে চাইলো। কিছুক্ষণ পর মুহু হাসির রেশ টেনে সঞ্জীব বললো, “আপনার হয়ে যদি সেখানে যাই, আপত্তি আছে?” “আপনি! কেন?” “যদি বলি, দেখার জন্ম?” “ব্যক্তিগত হলে বলার কিছু নাই।” “যদি বলি আপনাদের জন্য?” “শুধু শুধু নিজেকে ব্যস্ত ক’রে কি লাভ!” আবার মুহু হেসে সঞ্জীব বললো, “জগতের সবকিছুর হিসেব—লাভ লোকমান দিয়ে শেষ হয় না অপরেরাবা!” কথাটা শুনে অপরেরের মুখমণ্ডলে বিষন্নতার ছায়া গাঢ় থেকে গাঢ়তর হলো। সঞ্জীব সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দূরদিগন্তে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিয়ে পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। অপরের অপলক দৃষ্টিতে সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার মনের কিনারে কিনারে প্রশ্নের পর প্রশ্নের তরঙ্গ আছড়ে পড়তে শুরু করলো।

(১৩)

জীবন সুখ দুঃখ, আশা নিরাশার, জোয়ার ভাটার ভাঙা গড়ার ছন্দিত তরঙ্গ বুকে নিয়ে এগিয়ে চলে; এরই মাঝে সৃষ্টি হয় অতীত স্মৃতি ছোয়া আর এক জীবন, যে জীবন জীবনের প্রকৃত তাৎপর্যকে বুঝে নিয়ে বুঝে নেওয়ার স্বাদে কানায় কানায় ভরা—মর্তের সংগ্রামী জীবন! পুষ্পিতার জীবন এমনি ধারায় এগিয়ে চলেছে। স্বপ্নভাঙা জীবন, কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর এক নূতন জীবনের স্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত। এ জীবন শুধু বস্তুগত আত্মনির্ভরতা নয়, এ জীবন রুঢ় বাস্তবের মর্ম্মমূলে সংগ্রামী জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্ব যাচাই করার সাধনা নিতানৈমিত্তিক জীবনকে বাদ দিয়ে নয়, সব কিছুর মধ্যেই পরিপ্লুত।

শীতের আমেজ ধীরে ধীরে প্রকৃতিতে ছাপ ফেলতে শুরু করেছে। অশ্বিন মাস, অনাগত পূজার ছুটির গন্ধ ভেসে আসতে শুরু করেছে; পোষাকে আশাকে তার নিশানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। পুষ্পিতার সামনেই কিছুটা দূরে নূতন কাপড়ের স্তূপ, জামাপ্যান্ট তৈরী হবে। এসবের শিল্পী স্বয়ং পুষ্পিতা। ইয়া, শিক্ষক অপরেরেরই স্ত্রী—পুষ্পিতা! স্বামী পরিত্যক্ত জীবনের সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে দূরে ঠেলে দিয়ে সে নেমেছে জীবন যুদ্ধে—লড়াই ক’রে বাঁচতে হবে, বাঁচার মত বাঁচতে হবে! জামা কাপড় সেলাই ক’রে আজ তাকে জীবিকার্জন করতে হয়। এতেও সঙ্কুশান হয় না, গ্রামের মধ্যে এটা সব সময় সুলভ নয়। তাই এরই মাঝে যোগাড় ক’রে নিতে হয়েছে কয়েকটা টিউশনি। বাপের বাড়ীতে, ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই এই দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ধীরে ধীরে পুষ্পিতার মা শয্যা নিয়েছিলেন এবং তাতেই তাঁর অন্তিম শয্যা রচিত হয়েছিল। একটা নির্ভরযোগ্য আশ্রয় যেন হঠাৎ ভেঙে পড়েছিল পুষ্পিতার চোখের সামনে। তারপর তার ভ্রাতৃগৃহ জীবনে তাকে নিয়ে সংসারের অশান্তিময় বেনো জল ঢুকতে শুরু ক’রে। দাদা-বৌদির সঙ্গে বনিবনার অভাব শুরু হয় সদ্য জাগ্রত আত্মসম্মান উদ্ধুদ্ধ পুষ্পিতার।

ক্রমশঃ

“কিন্তু”

আদিত্য নাপথ স্মৃতিপাধ্যায় (বীরভূম)

মুহূর্তে মরা মাছের চোখের মত ফ্যাকাশে হয়ে যায় চোখ দুটো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাধুরী ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, তুমি এমন আহাম্মক, আর লোক পেলেনা। শেষে সেই শত্রু বাড়ীর ছেলেটাকে ডাকতে গেল—হুঁ, কবে যে তোমায় আকুল হবে!

ডাকতে যাবো কেন, ও নিজে থেকেই ছুটে এলো—নেসো মশাই, আমি কি কোন উপকারে লাগতে পারি? কি করি বলতো তখন—ভাগিয়ে দেবো? অযাচিত ভাবে রমাবিলাস যখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে—তোমাকে নার্সিং হোমে নিয়ে আসতে হবে, সে সময় কি যে করি আমি। তাছাড়া গভীর রাতে কে আর আমার জন্যে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করবে, হাতের কাছে আপন জনই-বা কে আছে তখন?

আগ্রহ সহকারে রমাবিলাস জিজ্ঞেস করে, ‘আমি গাড়ী আমি মেসোমশাই’!

‘গাড়ী তো নিশ্চয় প্রয়োজন।’

মাধুরী বেদনা ভরা কণ্ঠে বলে, ‘এরচেয়ে আমার মরণ ভাস ছিল—লজ্জায় এতটুকু হয়ে যাচ্ছি গো’।

‘বিপদের সময় লজ্জা-সরম করে কি লাভ?’

‘একটা দারুন ঝগড়া ঝাটির পর—ছিঃ ছিঃ রমার মা-বাবার বুকটা এবার গর্বে ফুলে উঠবে আর আমাকে চিরদিন তাদের কাছে ছোট হয়ে থাকতে হবে।’

‘এ তোমার মনগড়া হুঁশ। কে বললে ছোট হয়ে যাবে? না-না, ওসব নিয়ে তুমি এখন চঞ্চল হয়ে না। সেরে উঠে এ নিয়ে ভাববে!’

নার্স কাছে আসে, ঠুঁকে অযথা বিরক্ত করবেন না! উনি এখন মোটামুটি ভালই আছেন—আপনি আসতে পারেন’।

‘ঠিক আছে, আমি এখন যাচ্ছি। মাধুরী, বিকেলে এসে খোঁজ নিয়ে যাবো, কেমন?’

হাত ইশারায় কাছে ডাকে মাধুরী, ‘শোনো, যেন আর আদিখ্যেতা দেখাতে যেয়োনা ওদের বাড়ী—তোমার আবার একটুতেই সবাইকে সাবাস দে’য়ার অব্যাস আছে তো! ই্যা—পেয়ে বসবে!’

‘না—না, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও!’

স্নান হেসে পাশ ফিরে শোয় মাধুরী, ‘ঘু-ম! আর চোখের পাতা দুটো এক করতে পারব না। ঘুম কেড়ে নিয়েচে ও বাড়ীর মানুষজন! আমার কপাল—তা না হলে সিঁড়ি থেকে পা হড়কে পরে যাবো কেন রাত দুপুরে’!

ঘটনাটা গত রাতের।

প্রায় রাত এগারটা তখন। মাধুরী ওপর থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। খয়ের ওপর ভরসা রেখে নাবালক ছেলেমেয়েদের ভার দিয়ে টাক্সির খোঁজে রাস্তায় হাঁক ডাক করচি—রমা বিলাস ঘর থেকে বেড়িয়ে এলো— !

আমি বিস্মিত হলেও সে সময় তার সাহায্য অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের যে কিছুদিন আগে একটা চূড়ান্ত মন কষাকষি হয়ে গেছে এবং সে জের আজো অব্যাহত তা আর কে জানে।

তুচ্ছ ঘটনা !

মাধুরীর একখানা দামী শাড়ী ছাদে শুকোচ্ছিলো। কালবৈশাখীর ঝড়ে সেখানা উড়ে গিয়ে রমা বিলাসদের ছাদে পড়ে এবং সেখানা—

মাধুরীর ধারণা, সেখানা রমাবিলাসের মা গায়েব করেছে। প্রথমটা আমি বিশ্বাস করেছিলাম পরে স্বচক্ষে যা দেখেছি তাতে আসল অপরাধীকে চিহ্নিত করে শত চেষ্টাতেও তাকে বিশ্বাস করাতে পারিনি।

বড় একগুঁয়ে মাধুরী। তর্কাতর্কি করে একটা কাল্পনিক ধারণা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেয়। ‘শাড়ীখানা কি নিজে পরবে? বড় মেয়ের বাড়ী চালান করে দেবে! মাগীকে চিনতে আমার বাকী নেই, তুমি কি জানো, চমৎকার হাত সাফাই আছে! হ, শুধু কি শাড়ী চুরি, আরো—’

‘কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখলাম যে—’

‘বাজে কথা। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিনা। ওদের ঝি কি সাথে জবাব দিয়েচে? —গিন্নীর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা আর চোটামি দেখে লাথি মেরে চলে গিয়েচে।

‘আজই বাজারে দেখলাম ওদের ঝি তোমার সেই শাড়ীখানা পড়ে বাজার করচে। যেই সামনা সামনি হয়েছে, লুকোবার চেষ্টা করতেই আমি চৌংকার করে বললাম ‘কোথায় পেলেন এ শাড়ী’?

সে প্রথমটা খতমত খেলে কি হবে, পরক্ষণে ক্রখিয়ে দাঁড়ালো, ‘কেন ছোট কাজ করলে কি দামী শাড়ী পরতে নেই আমাদের? না দে’য়া খোয়ার লোক থাকতে নেই ভূ-ভারতে! মুখ সামলে কথা বলবেন, তা না হলে চাঁচিয়ে লোক জড়ো করবো।

‘মান বাঁচাতে চুপ করে গেলাম। বিশ্বাস করো মাধুরী, শাড়ীখানা তোমারই—।’

‘আর তো ভজাভজি করার উপায় নেই তাই তুমি আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করচো! হ্যা, সময় আর সুযোগ পেলে হারামজাদীকে ঠিক বুঝিয়ে দেবো! না-না, ওদের সঙ্গে আর কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখতে চাই না’।

ছ’মাস হলো। সেই থেকে বিভেদ চলে আসছে। অথচ পাশাপাশি বাস করতে গেলে যতখানা সৌহার্দ প্রয়োজন বলা যায় ততোধিক প্রভাব ছাড়াই মধো রেখাপাত করেছিলো অনেক দিন

ধরে। ছবাড়ীর গৃহিনী যেন পরস্পর হরিহর আত্মা! পাড়ায় অনেকে ঈর্ষা চেপে বসতো—যেন, ছুটিতে সহোদর ভগ্নী। আহা, কি সুন্দর অমায়িক ব্যবহার’।

কিন্তু এক ঝড়েই সব উড়ে গেল। পারিবারিক অশান্তির ভয়ে সব চেপে গেলাম এবং হজম করলাম।

নেপথ্যে নাটক তখন বেশ জমে উঠেছে।

বৈকালিক দৃশ্য আমাকে হতভম্ব করে দিলে।

আমার নার্সিং হোমে যাওয়ার আগেই রমাবিলাসের মা-বাবা দুজনেই মাধুরীর শিয়রে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছে, ‘প্রাণ্টার হয়ে গেছে—হু’এক দিনের মধ্যেই ছাড়া পাচ্ছেন তো? না-না, সে কি মাস দেড়েক কি আর বেশী সময়—সব দিক সামলে নেবো আমরা। পাড়া-পড়শীর বিপদে একটা কর্তব্য আছে তো? আপনি কিছু ভাববেন না—সে সামান্য ব্যাপার নিয়ে মন খারাপের কি আছে’?

মাধুরীর দু চোখ জলে ভরা! ধরা গলায় বলে, ‘বটে কিন্তু—’

রমাবিলাসের কাকা যুহু তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলেন, ‘পুরানো ব্যাপার নিয়ে কেন অশান্তি ভোগ করবেন। ভুল বুঝাবুঝি অনেক সময় হয়ে থাকে তা’বলে সংশোধন করা যাবে না’?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রমা বিলাসের মা বলেন, ‘আর বলিস্ না বোন, আমাদের সে ঝিয়ের চৌধুরিত্তির জন্যেই তো তাকে কাজে জবাব দিয়েচি! আমাদের অশান্তির মূলে তো সেই দায়ী’!

‘কিন্তু—’

অনুনয় কণ্ঠে রমাবিলাসের বাবা বলেন, ‘ঐ কিন্তুটা মন থেকে মুছে ফেলুন দয়া করে—প্লীজ’!

আমাকে দেখে সবাই উল্লসিত হয়ে ওঠে, ‘জানেন পরিতোষ বাবু, আমরা এখন থেকে আগেব মতো হয়ে গেলাম!’

‘সত্যি’?

‘যোল আনা—!’

বলতে দ্বিধা নেই, এ মিলন মধুর দৃশ্য আমার বুকে এ মুহূর্তে একটা মনোহর ছবি হয়ে এঁটে গেল। তবে মাধুরীর কপালের কুঞ্চিত রেখা দেখে বুঝতে পারা যায়, তার দ্বিধাগ্রস্ত মনে অজস্র ‘কিন্তু’ মহা সমারোহে পংক্তি ভোজনের আসর জমিয়ে তুলেছে।

অমরত্ব

সাবোজ কুমার পাণ্ড (মধ্য আন্দামান)

ভুলি নাই তোমায় হে স্মৃতির পাতা,
তোমার শ্যামলতা দিয়েছে আমায়—
চলার পথের অসংখ্য রাস্তা।

তুমি বলেছিলে স্মৃতি সব লয়ে গেছে
পরে আছে জীবনের ঝড় ও বজ্র
তাইতো হৃদয়ে স্মৃতি জাগে নারে বারে।
জীবনে স্মৃতি শুধু আছে গাঁথা প্রেম হয়ে।

বাঁচিয়া রইব মোর সৃষ্টি মাঝারে
জীবনের আছে সেথাই প্রাণ
স্মৃতির ও সৃষ্টির সঙ্গম যেথায়,

মৃত্যুর পরপারে রবে শুধু স্মৃতি বুক ভরা।

যে সৃষ্টি মোর রয়েছে—
পৃথিবীর বুক ধীরে ধীরে
বাড়িয়া উঠিবে জগতের বুক,
আমি রইব বেঁচে তাহারই মাঝারে।

প্রকৃতি গাইবে গান আনিবে কত
নূতন সকাল তাহার মাঝে
বাঁচিয়া রহিব মোর সৃষ্টি স্মৃতি মস্তনে।

মরিয়া হইব অমর আমার সৃষ্টির মাঝারে
কস্তুরী সম প্রেম ছড়াইব বিশ্ব চরাচরে।

মুখর

কেশব ভট্টাচার্য্য (হাওড়া)

তুমি কি চিরকালই মৌন
হে ধরিত্রী—
গ্রীষ্মে দাবদাহ প্রচণ্ড বর্ষার প্লাবনে
চতুর্দিক হিল্লোলিত
পূর্ণ আমায় ধরিত্রী আজও রহস্যময়ী
মন্দিরে জাগছে কলরব
পূজারি ব্যস্ত মাতৃপূজায়

ক্রন্দনরতা মা মৃত শিশুর
পাশে ঠায় বসে।
একটু পরেই হবে সকাল
পাখীরা শোনাবে কাকলি
তুমি কি শুধুই মৌন থাকবে
হে ধরিত্রী ?

সাগর দুহিতা

বেধা চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আন্দামানে বন্দী নিবাস বন্ধ করার কথা যখন ভাবা হচ্ছিল তখন সমস্ত ভারত জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার বইতে শুরু হয়ে যায়। একদিকে গান্ধীজীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন অপর দিকে সন্তাসবাদীদের স্বাধীনতা আন্দোলন সমগ্র দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে সমস্ত ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি যেন টল টলায়মান হয়ে পড়ে।

১৯২৫ সালে ৯ই আগষ্ট উত্তর প্রদেশের কাকোরী ষ্টেশনের কাছে চেন টেনে গাড়ি ধামিয়ে ব্রেকড্যান ভেঙ্গে সরকারী টাকা লুট হয়ে যায়। ফলে সমস্ত উত্তর প্রদেশ ধরে তল্লাশি চালিয়ে কয়েকজন বিপ্লবীকে ধরা হয়—এবং বিচারের প্রহসনের পরে কিছু লোকের ফাঁসি ও বাকিদের আন্দামান জেলে পাঠান হয়।

এরপর ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়। মাষ্টারদার নেতৃত্বে সেদিন ষাঁরা বিশেষ করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অন্যতম কয়েকজন হলেন নির্মল সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য—এঁদের সকলকেই আন্দামানে পাঠান হয়।

১৯৩২ সালে লাহোর আন্দোলনের ঘটনা স্বাধীনতার ইতিহাসে অন্যতম ঘটনা। বিচারে রাজ গুরু ভগৎ সিং এর ফাঁসি হয় আর বটুকেশ্বর দত্ত সহ অপর ৭ জন যাবৎজীবনের জগু আন্দামান জেলে পাঠান হয়।

এই সময় আন্দামান জেলের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল—বাড়ীঘর ভাঙা, ঔষধপত্র নেই খারাপ খাওয়া ছিল উপরন্তু প্রায়ই খাবারে পোকা থাকত অনেককেই মাটিতে কাঠের ওপর শুতে হত। জেল কর্তৃপক্ষ এঁদের কাউকেই ভাল নজরে দেখতেন না—এমন অবস্থায় বন্দীদের একমাত্র হাতিয়ার অনশন ১৯৩৩ সালের জানুয়ারীতে শুরু হয় এই অনশন—অবস্থা বেশী বাড়তে না দিয়ে তৎকালীন কমিশনার তাঁদের সকল অভিযোগ স্বীকার করে আশু সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন—কিন্তু কথার কোন পরিণতি দেখা গেল না এবং কোন কাজই হল না—দীর্ঘ চারমাস পরে ১২ই মে তারিখে ২৯ জন বন্দী অনশন শুরু করেন—ক্রমে ক্রমে আরো অনেকেই যোগ দিতে থাকেন। এই অনশন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বন্দীদের ওপর নানারকম অত্যাচার শুরু হয়—জোর করে নল ঢুকিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা চলে—ফলে মহাবীর সিং ও পরে মানকৃষ্ণ নন্দাস মারা যান।

ইতিমধ্যে অনশনের প্রায় ৪৬ দিন পার হয়ে গেছে—সারা ভারত জুড়ে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বইতে থাকে। অবস্থার সামাল দিতে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বারকার এলেন এবং প্রায় নিঃসর্তভাবে বন্দীদের সকল দাবীই মেনে নিলেন। ফলে ২৬শে জুন অনশন বন্ধ হল।

এবার বন্দীরা বিছানার চাদর, মশারী, তোয়ালে, বালিশ প্রভৃতি সরবরাহ পেতে লাগলেন। ভাতের চাল ও তরকারির মানও উন্নত হল। রান্নাঘরে তদারকির ভারও রাজবন্দীরা পেলেন এছাড়া কিছু কাগজপত্র ও পত্রিকা পেতে লাগলেন। খেলাধুলার ব্যবস্থাও করা হল। মোটমোট বন্দীরা একটু ভালভাবে থাকার সুযোগ পেলেন।

১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ডব্লিউ এ কমগ্রেভ চীফ কমিশনার হয়ে আসেন—তিনি ভদ্রগোছের লোক ছিলেন—এবং একজন অফিসার আসেন ডাঃ ক্যাপ্টেন বি চৌধুরী—এঁর সঙ্গে গণেশ ঘোষ প্রমুখ অনেক নেতৃবৃন্দের খুবই হৃদয়তা হয়েছিল। লাইব্রেরীতে বই কেনার অল্পমতি থাকলেও এ বিষয়ে কিছুটা অসুবিধা ছিল—তার মূল কারণ বন্দীদের বৈশীরা ভাগই বাঙালী এবং তাঁরা মার্কসীয় গ্রন্থের জন্য চাপ দিতেন অথচ ভারত সরকার এসব বই কিনতে দিতে চান না, এক্ষেত্রে অল্প প্রদেশের বন্দীরা নানা ধরনের বই চাইতেন এবং তা সহজেই পেয়ে যেতেন।

বন্দীদের মানসিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে—দেশের মাটির সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের অদর্শন তাছাড়া নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এই সকলের যুক্ত ফল স্বরূপ বন্দীদের শরীরও দিন দিন খারাপ হতে থাকে। এদিকে রাজনৈতিক নেতারা আন্দামানেব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের আন্দোলন করেছিলেন। এই চাপের মুখে পড়ে গভর্নর জেনারেলের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য স্তান হেনরী ফ্রেক আন্দামান ঘুরে গিয়ে বন্দীদের সমস্ত ব্যবস্থার বিষয় উচ্ছসিত প্রশংসা করেন—এটিকে “ফ্রেকের স্বর্গ” বলে অভিহিত করা হয়। এই বর্ণনা সকলে মেনে নিতে পারেনি পরন্তু এ নিয়ে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে—এই আক্রমণ থামানর উদ্দেশ্যে অ্যাসেম্বলীর দুই জন সদস্য রায়জাদা হনস্‌রাজ (কংগ্রেস) স্যার মোহাম্মদ ইয়ামিনকে (মুসলিমলীগ) আন্দামান পরিদর্শনে পাঠান হয়। সপরিবারে তাঁরা আন্দামানে এসে সব কিছু দেখে ফিরে গিয়ে যে রিপোর্ট দেন তাতে বলা হয়েছিল অন্যান্য জেলের তুলনায় সেলুলার জেলের ব্যবস্থা অনেক ভাল। তবে তাঁরা বন্দীদের কিছু কিছু দাবীর কথা বলেছিলেন। এঁদের পরিভ্রমণকে কেন্দ্র করে বন্দীদের মনে মুক্তি পাবার আশা জেগে ওঠে কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে কোন ফল না পাওয়াতে ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে আন্দামান সহ সারা ভারতের সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের কাছে একটি দাবী পত্র পাঠান হয়।

২৩শে জুলাই দাবী প্রত্যাখানের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে ২৪শে জুলাই ১৭৭ জন বন্দী অনশন শুরু করেন—১৯শে অগাস্টের মধ্যে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২২৫ জনে।

সারা দেশ জুড়ে অনশনের সমর্থনে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন জেলেও রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন শুরু করেন। কেন্দ্রীয় লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে তুলাভাই দেশাই অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা করেন। ৬২-৫৫ ভোটে সরকার পরাজিত হন।

আন্দামানের এই অনশন সারা দেশ জুড়ে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া এনেছিল—নেতারা ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আন্দোলন চালাতে থাকেন।

গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ ও কংগ্রেসের তরফে অনশন প্রত্যাহারের অমরোধ করে টেলিগ্রাম করা হয়—তখন ৫৬ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। এই অনশনে কিন্তু কোন বন্দীর মৃত্যু হয়নি।

১৯৩৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ঘোষণা করেন যারা অনশন থেকে বিরত হয়েছেন তাঁদের ভারতে পাঠানো হবে। তখনও আটজন বন্দী অনশন প্রত্যাহার করেন নি। সেপ্টেম্বর মাসে বন্দীদের প্রথম দলটি তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের বন্দীশালায় পাঠান হয়—এতে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ ও বাংলার পঞ্চাশজন বন্দী ছিলেন। এইভাবে ১৯৩৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তৃতীয় ও শেষ দলটি আন্দামান ছেড়ে যায়। ইতিমধ্যে ভারতের জেলে এই সব বন্দীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

আন্দামানের সেলুলার জেলে যখন রাজনৈতিক বন্দীরা নিজেদের মর্যাদা আদায়ের জন্য যুদ্ধ করে চলেছেন তখন বিশ্ব জুড়ে রণদামামা বেজে ওঠে—শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ।

জার্মানী ইতালির মিলিত শক্তির সঙ্গে মিত্র শক্তির পাঞ্জা লড়াই হচ্ছে তখন জাপান যোগ দিল এই মারণ মহোৎসবে। ভারত তথা আন্দামানের কাছাকাছি জায়গায় শুরু হয়ে গেল সামরিক তৎপরতা। ১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর জাপান বার্মা আক্রমণ করে। ১৯৪২ এর ২০শে মে বার্মা দখল সম্পূর্ণ হল। ইংরাজ দেশ ছেড়ে চলে গেল। আন্দামান ব্রহ্মদেশের প্রবেশ পথের ধারেই রেঙ্গুনে দখলের লড়াই চলার সময়েই জাপানীরা ২৩শে মার্চ ১৯৪২ পোর্টব্লেয়ার দখল করে নেয়। আন্দামানে জাপানী সৈন্য অবতরণ ও দখলের আগে মাঝে মাঝেই আন্দামানের আকাশে জাপানী বিমানের হানা শুরু হয়েছিল। অবস্থা বুঝে ইংরাজেরা রস দ্বীপ থেকে তাদের সব অফিসার এবং তাদের পরিবার বর্গকে আবারডিন বাজারে সরিয়ে নিয়ে যায়। রস দ্বীপ তখন প্রায় ভগ্ন স্থপে পরিণত হয়েছিল এদিকে সেলুলার জেলে ১৮০ জন শিখ সামরিক অপরাধী এবং প্রচুর সংখ্যক সেলফ সাপোর্টার বন্দী ছিল। পোর্টব্লেয়ার থেকে সর্বশেষ জাহাজটি ১৯৪২ সালের ১৩ই মার্চ যাত্রা করে। এরপর দীর্ঘ কয়েক বছর সাধারণ মানুষ আর দ্বীপ থেকে বেরুতে পারেনি।

জাপানীরা দ্বীপ অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গেই গুহিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে পড়ে। একজন কর্নেল বুচো মিভিল গভর্নর নিযুক্ত হয়ে প্রথমে কমিশনার ওয়াটার ফলকে বন্দী করেন এবং সেলুলার জেলের সব বন্দীকে মুক্ত করে দেন। তারা একটি জনসভার আয়োজন করে

সকলের সহযোগিতা চায় এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন শেষ করার কথাও ঘোষণা করে। মুখে জনসাধারণের উন্নতি করার কথা বললেও কার্যতঃ কিন্তু তারা মানুষের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালাতে থাকে। ইংরাজ তরফে প্রায়ই বোমা বর্ষণ করা হত—এ ব্যাপারে জাপানের ধারণা হয় কেউ স্পাই-এর কাজ করে ইংরাজদের খবরা খবর দিচ্ছে। এইভাবে যাদের সন্দেহ করে ধরা হত তাদের অকথা অত্যাচার করা হত।

১৯৪০ সালের ২৯শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে ভারতের Provisional Indian Government স্থাপিত হল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে। কয়েকদিন পরে জাপানের diet অর্থাৎ পার্লামেন্টে জেনারেল তোজো ঘোষণা করেন যে তিনি প্রভিশনাল গভর্নমেন্টকে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার ছেড়ে দেবেন। নেতাজী জাপানী সরকারের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানানেন। নেতাজীর প্রতিষ্ঠিত এই সরকারকে জন্মলগ্নেই জাপান, থাইল্যান্ড, মাঞ্চুরিয়া এবং নানকিং স্বীকৃতি জানিয়েছিল। আর স্বীকৃতি জানিয়েছিল জার্মানী এবং তার ইউরোপীয় মিত্রেরা।

এবার নেতাজী স্থির করলেন তিনি আন্দামান পরিদর্শনে যাবেন।

ক্রমশঃ

সম্পাদিকার কথা—

সর্বকালেই আধুনিক এবং বিগতের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে। উভয়ই উভয়ের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নানা যুক্তি দিয়ে থাকে। তবে একথা সত্য যে চিরকালই প্রাচীনকে নবীনের দরজায় এসে দাঁড়াতে হয় এবং একটা বোঝাপড়া করে মানিয়ে নিতে হয়। আর আজ যা আধুনিক আগামীতে তাই প্রাচীন হবে যায় তখন আবার সেই আবর্তের প্রবাহ চলতে থাকে। নিজের দেশের সব কিছুকে ছেড়ে বা তার মধ্যে সারতত্ত্ব ভুলে পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে ভুলে চোখকান বুঝে সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সচেष्ट প্রয়াস আমাদের এই ভারতের ভূমিতে বহুকাল থেকেই চলে আসছে! সাহিত্য সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, আদব কায়দা, চাল চলন, খাওয়া পরা সব কিছুতেই পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে পড়ার একটা মোহে আমরা ছুটে চলেছি। নিজেদের দেশের যা কিছু আছে বা অতীতে ছিল তার সব কিছুই আমাদের চোখে বড় অগ্রিয়মান বলে মনে হয়। আমরা সব কিছু ছেড়ে চোখ কান বন্ধ করে কেবল অনুকরণ করবার জন্যই যেন সচেष्ट হয়ে আছি।

কিন্তু প্রকৃতি গত পার্থক্য এবং দেশ কালের ব্যবধানে দুই দেশের মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে তাকে অস্বীকার করব কি করে। আমাদের জল হাওয়ায় পাশ্চাত্য দেশের অনুকূলে যাওয়া সম্ভব কিনা বা কতদূর যাওয়া উচিত তা আমরা একবার ভেবে দেখিনা। এমন কি সমাজ

ব্যবস্থার যে সব বিষয় পাশ্চাত্য আজ নিজেদের প্রয়োজনে পরিবর্তন করবার জন্য সচেষ্ট প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে আমরা আজকে তাদের সেই ফেলে আসা আচার আচরণকেই সাগ্রহে আঁকড়ে ধরতে চাইছি। আত্ম সুখের জন্য আমরা আজ একান্তবর্তী পরিবার ভেঙে নিজের নিজের সংসার আলাদা করে ফেলেছি। বৈজ্ঞানিক যুগে নিজেদের সুখ সুবিধা ও ভোগ বিলাসের মাসুল জোগাতে স্বামী স্ত্রী চাকরীর জন্য উমেদারী করে চলেছি। সাংসারিক জীবনে শাস্তির পরিবর্তে অশাস্তিকেই ভেকে আনছি। মা বাবা দুজনে চাকরী করতে হলে বাড়ীর শিশুর কি ব্যবস্থা হবে তা ভাবি না—তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে ক্রেম—সেখানে রুটিন মাসিক সব বিছুর ব্যবস্থা থাকলেও মানসিকতা থাকা সম্ভব নয়। আর মায়ের সংস্পর্শ ছাড়া যে শিশু জীবনে বড় হয় তার যে অভাব থাকে তা পূরণ করবে কি দিয়ে। মায়ের নিহনে শিশুর মানসিকতা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য—এই অভাব পাশ্চাত্য দ্রব্য গুনে বা জামা কাপড়ে পূরণ হয় না। কিন্তু বিক্ষিপ্ত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে একদিন ড্রাগের নেশার বলী হয়। জীবনে যাদের জন্য অর্থ উপার্জনের নেশায় মা বাবা ব্যস্ত ছিলেন ভবিষ্যতে সেই অর্থ কোন কাজে লাগবে তা ভাববার অবসরও পান না—কিন্তু কার্যতঃ সব কিছুই মিথ্যা হয়ে যায়। আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভ্রান্তি এই যে আমরা সকলেই এক পর্যায়ে পৌঁছতে চাইছি—মানুষের মধ্যে যেমন দেখার ক্ষেত্রে চেহারার ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে তেমনি মানসিকতারও তারতম্য আছে—যোগ্যতার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা থাকতে বাধ্য। এই গুলিকে স্বীকার করে নিয়ে যদি পূর্বাঙ্কে পরিকল্পনা করে সঠিক পথে চলে যায় তবেই উত্তর জীবনে শাস্তির পথ পাওয়া সম্ভব। ভূমৈব সুখম এই কথাটা মনে রাখতে হবে।

চলার গথে বলার কথা

বহুদর্শী

আমাদের এই বাগলায় সবকিছুই চোরাবালির মতন তলে তলে জল ঢুকে ওপর থেকে ধসে ভেসে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তখন বাঁচার উপায় থাকছে না। অনেক কিছুর মতই এ কলকাতায় বাংলা বইয়ের প্রকাশন জগতেও চোরাবালির নীচে দিয়ে শেঠীদের নোনাঙ্গল ঢুকে পড়েছে, সে খেয়াল আমাদের হয়নি। বাঙ্গালীর ঘুম যখন ভাঙ্গে চা-পর্ব তখন সমাধা।

অর্থলগ্নীর কথাই বলছি, অর্থ যখন অনর্থ সৃষ্টি করে, এক নম্বরী রাস্তা ছেড়ে রাস্তা তখন দশনম্বরীতেও পরিণত হয়। তখনই কালোয়ার শেঠীদের কালছায়া দেখি। এই কালছায়া ইদানীং কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের অলিগলিতে ঠাঁই নিয়েছে। টেক্সট বই থেকে টেস্টপেপার পর্যন্ত

নবের অগ্রিম জমা দিয়েও নির্দিষ্টসংখ্যক বই 'পাবলিশার্স এসোসিয়েশনই' দিচ্ছে না যখন তখন তাঁদেরই নাকের ডগায় বই বাড়তি দামে (১০, থেকে ২১,) আনাচেকানাচে বিক্রী হচ্ছে ! এ তো কতারাও জানেন । এমনকি রাতারাতি হুবহু নকল বই ছেপে নকল দামে বিকোচ্ছে । আর ছ'টোপথের দোরগোড়ায় গঙ্গী-নাসীন শেঠের তল্লিবাহক বেকার দরিদ্র বাঙ্গালী নোকরেরা !

কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশকেরা লেখকদের ঠকিয়ে চলেছেন এতদিন । এখন তারা এসব নিয়ে কি বলবেন ? মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবু এর বিহিত করুন ।

* * * * *

এই সেদিন পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় যা ঘটে গেল, তা নিয়ে পশুদেরও নাৎখৎ দেবার অবস্থা ! আমার একটা প্রস্তাব সকলদলের রাজনীতিবিদদের কাছে ।

সনাতনকালের মতন রাজনীতি চর্চায় ইচ্ছুক যুবকদের কি বছর পাঁচেকের জন্যেও কোন পর্বতগুহায় আশ্রমবাসী করে চরিত্র ও মানবতা শিক্ষা দেওয়া যায় না ? সেকালের সকল রাজপুত্রই তো বনবাসে পাঠ নিতো ! লজ্জার কি ?

অবশ্য প্রৱণ-সর্জন কর্তাদেরই ইচ্ছে !

With best compliments from :

S. S. TRADING CO.

Engineers and Govt. Contractors.

7, SANTOSH MITRA SQUARE,
CALCUTTA-700 012

Phones :

Office : 35-9870

Residence : 67-3380

— নিয়মাবলী —

লেখকদের প্রতি

- ১। 'আভা'তে প্রকাশের জন্য সমস্ত রচনা নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদিকার ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
- ২। অস্পষ্ট ও ভ্রান্তি হস্তাক্ষরে উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত রচনা বিবেচনা করা সম্ভব নয়।
- ৩। বাংলা যাদের মাতৃভাষা নয় এমন লেখক বা লেখিকার রচনা প্রকাশের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে।
- ৪। জাতীয় সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত যে কোন রচনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- ৫। নূতন লেখক-লেখিকার প্রকাশযোগ্য রচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।
- ৬। মিল ও ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে সুযোগ দেওয়া হবে।
- ৭। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।
- ৮। উপযুক্ত ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে কোন পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

গ্রাহকদের প্রতি

- ১। গ্রাহকদের এক বৎসরের টাঙ্গা মডাক ১৫ টাকা। আজীবন গ্রাহক টাঙ্গা মডাক ১০০ টাকা।
- ২। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
- ৩। ভি পিতে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়। গ্রাহকদের টাঙ্গা মনি অর্ডার যোগে 'আভা' কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

আভা পত্রিকা কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ সংখ্যা, গ্রন্থ-গঞ্জীসহ

ছাত্র-ছাত্রীদের ও বাংলা ভাষার গবেষকদের সহায়ক।

টাকা		টাকা	
শরৎ শত-বার্ষিকী সংখ্যা (দ্বিতীয় পর্ব),		বনফুল শ্রদ্ধার্থ সংখ্যা	৪
ভাষাস্তরে শরৎ সাহিত্য সহ	৬	আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা	৩
নজরুল স্মরণ সংখ্যা	২	প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা	৮
ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সংখ্যা	১	হীরেন বসু সংখ্যা	৫
আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা	৫	আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা	১০
ভাষাবিদ হরিনাথ দে জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা	৩	শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সংখ্যা	৫
তরু দত্ত স্মরণ সংখ্যা	৩	"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" সংখ্যা	৮
কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা	৪	অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.) সংখ্যা	৮

— অগ্রিম মূল্য আবশ্যক —

প্রাপ্তিস্থান : 'আভা' কার্যালয়, ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬



মূল্য ২'০০ টাকা
Price Rs. 2'00

আভা—ABHA

Regd. No. WB/SC 73
R. N. 18638/72

বৈশাখ—১৩৯৬

April—1989

নব নীড় (মহিলা—আবাস)

৩০, অশোক এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০৪০

ও

১/২ শ্রাম বোস রোড, চেল্লা, কলিকাতা-২৭

কেনলমাত্র বৃদ্ধা মহিলাদের জন্যে, স্বল্পব্যয়ে সর্ববিধ
সুবিধাসহ থাকার ব্যবস্থা আছে।

পরিচালনায় :—

উদ্যমতপ্, কো-অর্ডিনেটিং কাউন্সিল

৫/১, রেডক্রস্ প্রেস, কলিকাতা-৭০০০০১

গিরিবালা মহিলা নিবাস

ছাত্রী ও কর্মবতা মহিলাদের

আবাসিক ব্যবস্থা আছে।

ফোন : ৪৭-৮১৭২

মিশন হোমিও ক্লিনিক

৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬।

ডাঃ জি, ডি, চ্যাটার্জী

ভারতীয় বনৌষধী হইতে বিভিন্ন

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আবিষ্কারক।

সীক্ষাকালের সময় :

সকাল ১১টা—১১টা ও সন্ধ্যা ৬টা—৮টা।

ফোন : ৪৭-৮১৭২

চেম্বার : ৪৭-৬৮৬৮

ল্যান্ডডাউন মার্কেটের বিখ্যাত মৎস্য ব্যবসায়ী

শ্রীমধুসূদন বা

বিবাহ অথবা উৎসবে কিংবা নিজ প্রিয়

রকম মৎস্য গ্রাহ্য মূল্যে সরবরাহ করে

যোগাযোগ করুন :

মৎস্য পট্টর ১তম ফেল, ল্যান্ডডাউন মার্কেট

To :—

Sri/Sm The Librarian

The University of Calcutta

College Square

Calcutta - 700013

নারী সেবা-সংঘ

১১/১/২এ, গড়িয়াহাট রোড, যোধপুর পার্ক,

কলিকাতা-৭০০০৬৮

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান।

হুঃস্থ মেয়েরা হোমে থেকে নানা ধরনের তাঁতের কাজের

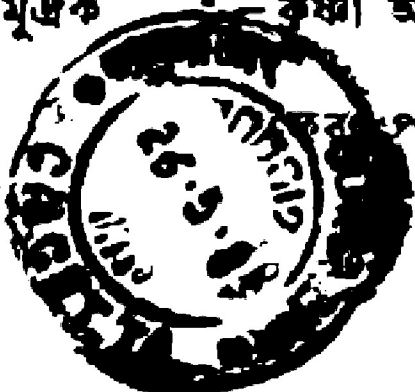
শিক্ষা পায়। এ ছাড়া ইণ্ডাসট্রিয়াল ট্রেনিং স্কুলে

স্বল্প বেতনে মেয়েরা নানা হস্তশিল্প শিখতে পারে

এবং ক্যাটিন সব রকম খাবার সরবরাহ করে থাকে।

প্রকাশক :—শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়, ৭৩সি, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৬।

মুদ্রক :—কল্যাণ আর্ট প্রেস, ৩১, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২০।



কল্যাণ পাঠাতে হলে প্রকাশকের ঠিকানায় পাঠাবেন।